ডাঃ মনীশ প্রধান

স্মরণীয় আবিষ্কার



স্মরণীয় আবিষ্কার

ডাঃ মনীশ প্রধান

স্বপ্নদীপ
৭/ই শীতলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৫

প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৮৮
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ অনুপ রায়
গ্রন্থস্বত্ব আশিস প্রধান
স্বপ্নদীপের পক্ষে মিতা সাহা কর্তৃক ৭/ই শীতলা লেন কলকাতা-৫ থেকে প্রকাশিত এবং মহামায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৬৬বি মানিকতলা স্ট্রিট কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

১৪·০০

বাবার স্মৃতির উদ্দেশে

বিষয়সূচী

রক্তদানের ইতিকথা ৯
ক্লদ বার্ণার্ড ১৮
কেমন করে হল ২৪
রক্তচাপ মাপার যন্ত্র
থার্মোমিটার
ইনজেকশন সিরিঞ্জ
ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ
হৃদপিণ্ডে ক্যাথিটার চালনা
আলট্রাসনোগ্রাফি
হেনরি ক্যাভেনডিস ৪১
জোসেফ প্রিসলে ৪৭
এণ্টনি টরেণ্ট ল্যাভয়সিয়ের ৫৫
রেডিয়াম ও মাদাম কুরী ৬৩
কুষ্ঠরোগ ৭৬
ভিটামিন ৮৭
ডঃ সুব্বা রাও ৯৯
হরগোবিন্দ খোরানা ১০৫

ভূমিকা

চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিরলস গবেষণা ও সাধনার কাহিনী সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার বাসনায় কলম ধরেছিলাম। 'আবিষ্কারের পিছনে' শিরোনামে সেগুলি ধারাবাহিকভাবে 'শুকতারা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ঐ নামেই বই আকারে প্রকাশিত হয়। বইখানি সাধারণ পাঠক, সমালোচক প্রত্যেকের কাছ থেকেই অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা ও প্রশংসা পেয়েছে। অনুরোধও এসেছে অনেকের কাছ থেকে এ বিষয়ে আরও লেখার জন্য। সেই অনুরোধ রাখার চেষ্টায় এই বই। তাঁদের যদি ভালো লাগে তাহলেই আমি খুশী। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বইটি প্রকাশ করার জন্য বেশ কিছু মুদ্রণপ্রমাদ থেকে গেছে। বইয়ের শেষে সেগুলি যথাসম্ভব সংশোধন করে একটি শুদ্ধিপত্র সংযোজিত হয়েছে।

মনীশ প্রধান

রক্তদানের ইতিকথা

উনবিংশ শতকের শেষের দিকে বিজ্ঞানের সব বিভাগে উন্নতির সূচনা হয়েছিল। তার ফলশ্রুতি হিসাবে বিশ শতকের শুরু থেকেই বিজ্ঞানের বিকাশ আরও দ্রুত হতে থাকে।

বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি একদিকে নিয়ে এসেছে বিশ্বধ্বংসের ভয়াবহ সম্ভাবনা ; অন্যদিকে পাশাপাশি আর এক শ্রেণীর বিজ্ঞানী নিরলসভাবে চেষ্টা করে চলেছেন কি উপায়ে মানব সমাজের কল্যাণ সাধন সম্ভব হতে পারে। তাই আমরা দেখি একদিকে চলেছে উন্নততর মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের প্রতিযোগিতা, একই সঙ্গে অন্যদিকে দেখতে পাই নানারকম রোগের কবল থেকে মানুষকে রক্ষা করার চেষ্টা। নানা দেশে পরিবেশ শুদ্ধিকরণ করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টার সঙ্গে দেখি প্রাণী জগৎকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করার সংগ্রাম।

এই শতকের প্রথম দিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা বিভাগে অনেক উন্নতি হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা সেই সময় একটা বড় বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হলেন যখন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মানুষের শরীরে রক্ত সঞ্চালন করে তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করা সম্ভব হল।

এই প্রচেষ্টায় সাফল্য এসেছে এই শতকে কিন্তু প্রাথমিক চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল অনেক বছর আগে।

সভ্যতার আদি থেকেই মানুষ জানতো যে রক্ত মানুষের জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রাচীন রোমের কবিরা গান গেয়ে বলতেন রোগীর রক্ত বদল করে, যাদুমন্ত্রের সাহায্যে রোগ সারানো

সম্ভব। পোপ অষ্টম ইনোসেনট-এর শরীরে শক্তি সঞ্চারের জন্য তিনজন তেজী শক্তিশালী যুবককে হত্যা করে, তাদের শরীরের রক্ত পাত্রে ভরে পোপকে পান করানো হয়েছিল। পোপ অবশ্য বাঁচেননি ; তবে তার চিকিৎসক পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন।

আজ যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষের শরীরে রক্ত দেওয়া হয়, তার সূত্রপাত কিন্তু স্যার ক্রিষ্টোফার রেন নামে এক দার্শনিকের কাজের মধ্য দিয়ে। তিনি ছিলেন ইংলণ্ডের 'রয়েল সোসাইটির' একজন ফেলো। ১৬৫৭ সালে থেকে তিনি বিভিন্ন জন্তুর শিরার মধ্যে নানা রকমের তরল রাসায়নিক পদার্থ ইনজেকশন দিতেন, জন্তুর ব্লাডারে ভরে ফাঁপা সূচের সাহায্যে। তাতে কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত কিছু খারাপ হোত না ; কিন্তু বেশীর ভাগ প্রাণীর শরীরে এর ফলে খারাপ প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখা যেত। কখনও হয়তো সেই জন্তুটি মারা পড়ত।

এই পরীক্ষার আট বছর পরে উইনকিন্‌স নামে এক বিজ্ঞানী কুকুরের প্রধান শিরা থেকে রক্ত নিয়ে একটি ব্লাডারে ভরে, সেই রক্ত অপর এক কুকুরের পায়ের শিরায় ইনজেকশন দিলেন। এর ফলে দ্বিতীয় কুকুরটির শরীরে কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি।

এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে সে যুগের বিজ্ঞানীরা অন্য জন্তুর শিরায় রক্ত সঞ্চালন করেন। অনেক ক্ষেত্রে ফল খারাপ না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে খারাপ ফল দেখা গিয়েছিল।

১৬৬৭ সালের ১৫ই জুন ডেনিস নামে একজন চিকিৎসক ভেড়ার গলার ধমনী থেকে নয় আউন্স রক্ত নিয়ে একজন ১৫ বছরের বালকের শিরায় ইনজেকশন করেন। বালকটির শরীরে এর ফলে কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। মাস পাঁচেক পরে ডাঃ লোয়ার ভেড়ার রক্ত একজন মানুষের শিরায় ইনজেকশন দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রেও কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ডাঃ ডেনিস আরও রোগীর শিরায় রক্ত সঞ্চালন করেন। কিন্তু চতুর্থ রোগীর ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা

গেল। প্রথমবার রক্ত দেওয়ার সময় কোন খারাপ ফল দেখা যায়নি ; দ্বিতীয় বার কিছু খারাপ লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু তৃতীয় বার রক্ত দেওয়ার পর রোগীটি মারা যায়। তখন সেই রোগীর পত্নী আদালতে অভিযোগ করলেন যে ডাঃ ডেনিস বিষ প্রয়োগ করে তার স্বামীকে হত্যা করেছেন। পরে তদন্তে জানা গিয়েছিল রোগীকে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন তার স্ত্রী।

সত্য প্রকাশ পাওয়া সত্বেও রক্ত সঞ্চালন চিকিৎসা পদ্ধতি এই অপবাদে দারুণ বাধা পেয়েছিল। ডাক্তাররা ভয় পেয়েছিলেন, যেজন্য গত শতক পর্যন্ত আর কেউ রক্ত ইনজেকশন দিতে সাহস করেন নি।

শেষ পর্যন্ত গত শতকে লণ্ডনের গাইজ-হাসপাতালে ডাঃ ব্লানডেন মানুষের শরীরে কি উপায়ে নিরাপদে রক্ত দেওয়া সম্ভব হতে পারে সেই বিষয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করেন। তিনি প্রমাণ করেন একজাতীয় প্রাণীর রক্ত অন্য জাতের প্রাণীর শরীরে ইনজেক্শন দিলে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা বেশী। সেই জন্য তিনি সিদ্ধান্তে এলেন, মানুষের জন্যে দরকার মানুষের রক্ত। কিন্তু এই তথ্য কিভাবে তিনি প্রমাণ করবেন। কাউকে রক্ত দিতে গিয়ে যদি রোগীর মৃত্যু হয়, তাহলে তিনি বিপদে পড়বেন।

তবে শেষ পর্যন্ত এই সমস্যার হোল। খুব খারাপ রোগী, যার বাঁচার সম্ভাবনা নেই, আত্মীয়রা দায়িত্ব নিয়ে লিখিত অনুমতি দিলে সেই রোগীকে রক্ত ইনজেকশন দেবেন ডাঃ ব্লানডেন। রক্ত দেওয়ার পরে যদি রোগীর মৃত্যু হয়, আত্মীয়রা ডাক্তারকে দায়ী করতে পারবেন না।

১৮১৮ সাল। এমন এক রোগী এলো যাকে রক্ত না দিলে মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু রক্ত কোথায় পাওয়া যাবে? এগিয়ে এলেন ডাঃ ব্লানডেনের সহকারীরা। এক একজনের কাছ থেকে সিরিঞ্জে রক্ত ভরে নিয়ে রোগীর শিরায় ইনজেকশন দেওয়া হোল। রোগীটি বেঁচে গেল।

পরবর্তী কয়েক বছরে তিনি উনিশজন গুরুতর অসুস্থ রোগীর শরীরে রক্ত ইনজেকশন দিয়েছিলেন। রোগীর আত্মীয়রা লিখিত অনুমতি দিয়েছিল। ডাঃ ব্লানডেনের বক্তব্য ছিল, এরা যদি বেঁচে যায় খুব ভাল ; কারণ এদের বাঁচবার কোন সম্ভাবনা নেই। এখন রক্ত দিয়ে দেখা যাক কোন খারাপ ফল হয় কিনা ? আর খারাপ যদি হয়, তার প্রকৃতি কি ? একথা আজ স্বীকার করতে হবে যে বিজ্ঞানভিত্তিক রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি ডাঃ ব্লানডেন সর্বপ্রথম আরম্ভ করেন।

এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের শরীরে নিরাপদে কি ভাবে রক্ত-দান সম্ভব, এই বিষয়ে ডাঃ ব্লানডেন পরে বহু বছর ধরে গবেষণা করেছিলেন। ১৮২৯ সালে, অর্থাৎ তিনি প্রথম যাকে রক্ত দিয়েছিলেন সেই ঘটনার এগারো পরে এমন এক রোগী এলো যার বাঁচার সম্ভাবনা ছিল খুব কম। সেই রোগীর শিরাতে ৮ আউন্স পরিমাণ রক্ত ইনজেকশন দিয়েছিলেন। এই রক্তটুকু তিনি নিয়েছিলেন তাঁর এক সহকারীর শরীর থেকে। রক্ত দিতে সময় লেগেছিল তিন ঘণ্টা এবং বোধ হয় এর ফলে রোগীর জীবন রক্ষা হয়েছিল।

রক্ত ইন্‌জেকশন বেশী সংখ্যক রোগীর ওপর দেওয়ার সময় নতুন অসুবিধা দেখা গেল, সেটা হল রক্ত জমে যাওয়া। এর ফলে ইনজেকশন দেওয়ার সূচ বন্ধ হয়ে রক্ত নষ্ট হতে লাগল। এই সমস্যা এড়াতে হলে দাতার শরীর থেকে রক্ত নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহীতার শিরায় দিতে হবে।

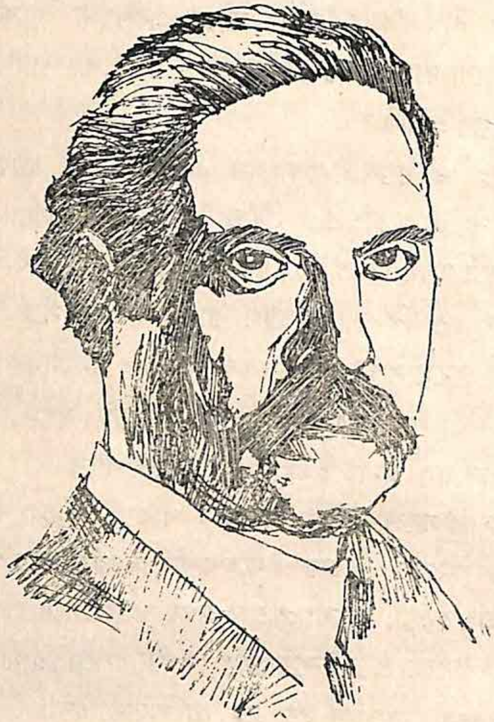
পরে ডাঃ জেমস এভেলিং ১৮৬৩ সালে এমন একটি যন্ত্র তৈরী করেন, যার দ্বারা একজনের শরীর থেকে রক্ত নিয়ে অন্যের শরীরে দেওয়া খুব সহজ হয়েছিল। যন্ত্রটা ছিল খুব ছোট, পকেটে করে নিয়ে যাওয়া যেত। এবার এভেলিং রোগী খুঁজতে লাগলেন, কাকে রক্ত দেওয়া দরকার। কিন্তু কেউ রাজী হতে চায় না। রক্ত না দিয়ে শান্তিতে মরা অনেক ভাল। রক্ত দেওয়ার পরে জ্বর, কাঁপুনি নিয়ে মরতে কেউ রাজী নয়। ডাঃ এভেলিং কিন্তু হাল ছাড়েননি, সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

সুযোগ এলো দীর্ঘ ন'বছর পরে ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের সময়। এই যন্ত্রের সাহায্যে দাতার রক্ত নিয়ে আহত সৈন্যদের শরীরে সোজা-সুজি দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

রক্ত সংগ্রহ ও রক্ত ইনজেকশন এইভাবে বহু বছরের চেষ্টা ও ব্যর্থতার পর সম্ভব হয়েছিল। বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা রোগীদের শিরায় রক্ত ইনজেকশন দিতে গিয়ে বহুবার বিপদের মুখে পড়েছেন। এক সমস্যা ছিল রক্ত কি ভাবে তরল রাখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত দেওয়া তো সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এই সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল ১৯২৪ সালে। দেখা গেল সোডিয়াম সাইট্রেট নামে একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ রক্ত জমাট হওয়া বোধ করতে পারে।

একটি গুরুতর সমস্যার কোন সমাধান পাওয়া যাচ্ছিল না। যেমন, একজনের রক্ত অন্যের শিরায় ইনজেকশন দেওয়ার পরে গায়ে ব্যথা, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর হওয়া, কালো প্রস্রাব হওয়া এবং শেষে রোগীর মৃত্যু। পরে জানা গেল অন্যের রক্ত ইনজেকশন দেওয়ার পরে রোগীর লোহিত কনিকাগুলি ভেঙে যাওয়ার জন্য এই প্রতিক্রিয়া হয়। এই ভয়াবহ উপসর্গের কোন চিকিৎসাও জানা নেই। চিকিৎসক এই দৃশ্যের অসহায় দর্শক, পরে রোগীর আত্মীয়দের কাছে তার জুটত দুর্নাম ও অপমান।

তবে এই সমস্যারও সমাধান হয়েছিল। কার্ল ল্যাণ্ডস্টিনার নামে এক বিজ্ঞানী এই বিষয়ে গবেষণা করেন। তাঁর জন্ম অষ্ট্রীয়ায়, তবে তিনি গবেষণা করেন আমেরিকায়। ১৯০০ সালে তিনি পরীক্ষা দ্বারা জানালেন বিভিন্ন মানুষের রক্তের প্রকৃতি ভিন্ন রকম হতে পারে। একটি পরীক্ষা দ্বারা তিনি এই তথ্য প্রমাণ করলেন যে একজনের রক্তের জলীয় অংশের (সিরাম) সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে লোহিত কণিকাগুলি দলা পাকিয়ে (agglutination) যায়; আবার কোন ক্ষেত্রে তা হয় না। লোহিতকণিকা অন্যের সিরামের মধ্যে বেশ মিলে মিশে থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে লোহিতকণিকার ও অন্যের সিরাম এক



কার্ল ল্যাণ্ডস্টিনার

ধরনের নয়। একজনের রক্ত অন্যের ভিন্ন প্রকৃতির রক্তে মিশলে মৃত্যু ঘটতে পারে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একের রক্ত অন্যের শরীরে কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। কারণ উভয়ের রক্তের প্রকৃতি একই রকমের।

ল্যাণ্ডস্টিনার এই পরীক্ষার কাজে ল্যাবরেটারীর সহকারীদের রক্ত ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর রক্ত এই পরীক্ষায় লেগেছিল। তিনি দেখেছিলেন মানুষের রক্তে তিন ধরনের জটিল পদার্থ আছে তার নাম এগ্লুটিনোজেন। রক্তের শ্রেণী ভাগ অনুসারে এর নামকরণ করা হয়েছিল। ইতিপূর্বেই তিনি রক্ত তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন— 'এ', 'বি' এবং 'ও'। তাঁর রক্তের গ্রুপ ছিল—'ও'। তাঁর এই

আবিষ্কারের পরের বছরেই তাঁরই সহকারী ও ছাত্র স্টুরলি ও ভন ডি ক্যাসটেলো নতুন এক গ্রুপ আবিষ্কার করেন—'এ-বি'। এই শ্রেণীর রক্ত খুবই কম পাওয়া যায়।

এই চার গ্রুপ বা শ্রেণী অনুসারে চার ধরনের এগ্লুটিনোজেন পাওয়া যায়। লোহিতকণিকা ও সিরাম যদি ভিন্ন গ্রুপের হয় দুটির মিশ্রণে রক্ত দলা পাকিয়ে যায় (এগ্লুটিনেশন)।

বিশ্বের মানুষকে রক্তের শ্রেণী হিসাবে চার ভাগে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর গ্রুপ 'এ', কিছু লোকের কণিকা 'বি' গ্রুপ খুব কম লোকের 'এ-বি' গ্রুপ এবং পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেকের 'এ'-'বি' কোন এন্টিজেন থাকে না তারা 'ও' গ্রুপের। পশ্চিমবঙ্গে ৩৭৯৪৫ জন রক্ত দাতার উপর সমীক্ষায় 'এ' গ্রুপে শতকরা ২০, 'বি' গ্রুপে ৩৪, 'ও' গ্রুপে ৩৩ এবং 'এ-বি' গ্রুপে ৯ জন শ্রেণীভুক্ত বলে জানা গিয়েছে। এখন যদি কোন লোককে এমন এক লোকের রক্ত দেওয়া হয় যার এন্টিজেন ভিন্ন প্রকৃতির, সে ক্ষেত্রে উভয়ের রক্ত একসঙ্গে মিশলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে, এমন কি মৃত্যুও হতে পারে। যদিও ল্যাণ্ডস্টিনার ১৯১০ সালের মধ্যে এই যুগান্তকারী গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন তার স্বীকৃতি দিতে নোবেল কমিটি খুব দেরী করেন। ১৯৩০ সালে তাঁকে ঐ কাজের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার নেওয়ার সময় তিনি খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, "এই কাজটা এমন কিছু কঠিন নয়। মাইক্রোস্কোপে চোখ দিলে সহজেই দেখা যাবে বিপরীত ধর্মী রক্ত ও সিরাম কিভাবে দলা পাকিয়ে যায়। খালি চোখেও দেখা যেতে পারে।"

১৯৪০ সালে ল্যাণ্ডস্টিনার বানর ও মানুষের রক্তে আর এক বিশেষত্বের সন্ধান পেলেন। সেই কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন আলেকজাণ্ডার উইনার। সহকারী উইনার বানরের রক্ত নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন। বানরের শ্রেণী ছিল 'রিসাস' গোষ্ঠীর। দেখা যায় সেই বানরের সিরাম শতকরা ৮৫ জন ককেশীয় শ্রেণীর মানুষের রক্ত

দলা পাকিয়ে দিচ্ছে। তাহলে সেই বানরের রক্তে এমন কি জিনিষ থাকতে পারে—যা এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটায়। গবেষণায় জানা গেল মানুষের শরীরে শতকরা ৮৫—৯০ টি ক্ষেত্রে 'রিসার্স জাতীয় পদার্থ বা আর-এইচ-ফ্যাকটর (Rh factor) থাকে। যদি এই বিষয় পরীক্ষা না করে রক্ত দেওয়া হয় হয়ত প্রথমবারে কিছু হবে না, পরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। মা ও তার শিশুর ক্ষেত্রে এই ফ্যাকটর বিপরীত ধর্মী হলে শিশুর মৃত্যু হতে পারে।

এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করার সময়ে ১৯৪৩ সালে কার্ল ল্যাণ্ডস্টিনার পরলোক গমন করেন। পরে অন্য গবেষকদের চেষ্টায় রক্তে আরও কয়েক প্রকার এন্টিজেনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তবে সেগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ।

* * *

রক্ত বিষয়ে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু আহত সৈনিক ও নাগরিকের জীবন রক্ষা সম্ভব হয়েছিল সময়মত তাদের শরীরে রক্ত সঞ্চালন করে। কোন গুরুতর আঘাতে যদি অনেক রক্ত শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, কোন কোন রোগ যেখানে রক্তনালী বা জলিকা ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে যায় অথবা এমন কোন রোগ যেখানে দরকার মত রক্ত শরীরে তৈরী হয় না, সেই সব অবস্থায় রক্ত দেওয়া হলে অনেক সময় মৃত্যুকে পরাজিত করে মানুষ জীবন ফিরে পেতে পারে।

একটি বিজ্ঞাপন খবরের কাগজ, রাস্তায় বা হাসপাতালের পোষ্টারে অথবা সিনেমার পরদায় আমাদের চোখে পড়ে। সেই সঙ্গে থাকে রক্তদানের আবেদন।

'এক বোতল রক্ত আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে ; সেই রক্ত কি তুমি আমাকে দিয়েছিলে ?' সঙ্গে একটি শিশুর ছবি, সে যেন তার সামনে কাউকে এই কথা জিজ্ঞেস করছে।

কিছু লোক আছে যাদের পেশা বিভিন্ন হাসপাতলে বা ল্যাবরেটারীতে গিয়ে নিজের রক্ত বিক্রি করা। এদের রক্ত কিন্তু ভাল নয়। কারণ যারা অভাবে রক্ত বিক্রি করে, তারা অপুষ্টিতে ভোগে ; তাদের রক্তের মান খারাপ। তাছাড়া ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, জনডিস্ ও এইডস্ ব্যাধিও থাকতে পারে তাদের। অনেক সময় প্রয়োজনের তাগিদে এসব পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হয় না।

আর এক শ্রেণীর দাতা রক্ত দিতে আসেন নেহাত দায়ে পড়ে ; যখন কোন নিকট আত্মীয়ের রক্তের প্রয়োজন হয়। আজকাল অবশ্য কোন ক্লাবে বা কলেজে, কোন বিশেষ দিনে একসঙ্গে অনেকে রক্তদান করেন। রক্ত ব্যাঙ্ক থেকে ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার বা তার সহকারীরা বরফের বাক্সে রক্তের বোতল ভরে ব্যাঙ্কে এনে জমা রাখেন। কারো যখন রক্ত দরকার হয় তখন তার রক্তের নমুনা ব্যাঙ্কে রাখা রক্তের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে সরবরাহ করা হয়। এই রক্ত কত শত শত অসুস্থ লোককে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে আনছে তা হিসেব করে বলা সম্ভব নয়।

এখন দেশের প্রায় সব বড় হাসপাতালে রক্ত ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে। সেখানে রক্তের উৎস কিন্তু মানব সেবায় অনুপ্রাণিত জনসাধারণ। যদি আমরা ব্যাঙ্কে নিজে থেকে রক্ত না দিই, তাহলে রক্ত আসবে কোথা থেকে ? কোন প্রাণীর রক্ত তো মানুষকে দেওয়া সম্ভব নয়। এটা আমাদের দেখা উচিত যেন দাতার অভাবে ব্যাঙ্কের কাজে ব্যাঘাত না ঘটে। জেনে রাখা ভাল, যে রক্ত দিলে দাতার শরীরে কোন ক্ষতি হয় না। অল্প দিনেই দান করা রক্ত আবার শরীরে তৈরী হয়। আমাদের দেখা উচিত এই জনহিতকারী ও অতি প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্ক যেন আরও বড় ও সমৃদ্ধশালী হয়, যেন রক্তের অভাবে একটি মানুষকেও পৃথিবী থেকে অকালে চলে যেতে না হয়। একটি শিশুর রক্তের প্রয়োজন যদি আপনার দেওয়া রক্তে পূরণ হয়, তার চেয়ে আর কি হতে পারে ?

ক্লদ বার্নার্ড

'তোমার মধ্যে নাট্যকার হওয়ার সম্ভাবনা কম। তুমি যখন ওষুধের দোকানে কাজ করো, তোমার ডাক্তারী পড়তে যাওয়া উচিত।

এই উপদেশ দিয়ে সোর্বর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের অধ্যাপক ও খ্যাতনামা নাট্য সমালোচক গিয়াডিন ১৮৩৪ সালে এক একুশ বছর বয়সের যুবকের নাটক রচনার বাসনায় সমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন। সেদিন তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে কতখানি উপকার করেছিলেন তা কেউ অনুমান করতে পারে নি।

অধ্যাপক গিয়াডিনের উপদেশে যুবকটি সাহিত্য সাধনা ইতি করে সেই বছরেই প্যারী'র মেডিকেল স্কুলে-ভর্তি হলেন।

যুবকটির নাম ক্লদ বার্নার্ড। ১৮২৩ সালের ফ্রান্সের সাঁ-জুলে গ্রামে এক গরীবের ঘরে তাঁর জন্ম। বাবা আঙ্গুরের ক্ষেত পাহারা দিতেন ; আর অসচ্ছল সংসারে কিছু আয় বাড়াবার জন্যে অবসর সময়ে গ্রামের ছেলেদের পড়াতেন। স্কুলের বাড়ী ছিল না, নিজের বাড়ীতেই পাঠশালা বসত। পরে তিনি নিজে জেস্যুইট কলেজে গ্রীক, অঙ্ক ও জ্যামিতি শিক্ষা করেন।

ক্লদের ছাত্রজীবনে কোন বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়নি। পড়তে তাঁর একেবারেই ভাল লাগত না। সুতরাং সময় নষ্ট না করে মাত্র আঠারো বছর বয়সেই তাঁকে একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবীশ কর্মচারী হিসাবে কাজ করতে পাঠানো হল। কাজটা ছিল খুবই সামান্য, একটি পশু চিকিৎসা বিদ্যালয়ে নিয়মিত ওষুধ পৌঁছে



ক্লদ বার্নার্ড

দেওয়া। বোধহয় এই কাজই তাঁকে প্রাণীর উপরে পরীক্ষামূলক চিকিৎসার প্রেরণা এনে দিয়েছিল।

এই কাজ কিছুদিন করার পর একঘেয়েমির ক্লান্তি তাঁকে আচ্ছন্ন করে। তাঁর প্রথম নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ সালে। কিছুটা সাফল্য দেখা গিয়েছিলে প্রথম নাটকটিতে। উৎসাহিত হ'য়ে রাজা জনের বিয়োগান্ত কাহিনী অবলম্বন করে দ্বিতীয় নাটকটি রচনা করেন। এই নাটকটি অসফল হওয়াতে ক্লদ সব কাজ ছেড়ে মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হলেন।

মেডিকেল স্কুলে ছাত্র হিসাবে তিনি কিন্তু সাধারণ ছাত্রদের উপরে

উঠতে পারেন নি। এনাটমি'র (Anatomy) মৌলিক বিষয়গুলি বুঝতে তাঁর বেশ সময় লেগেছিল। অবশ্য এই সময়ে অর্থাভাবের জন্য তাঁকে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের শিক্ষকতা করতে হয়েছিল।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্লদ বার্নার্ড কোনরকমে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু ডাঃ ম্যাজেণ্ডির কাছে কাজ করার সময়ে তাঁর জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে। এই খ্যাতনামা শিক্ষক তাঁর ছাত্রের মধ্যে প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেয়েছিলেন এবং ক্লদ্‌কে স্নায়ু বিষয়ে গবেষণা করতে উৎসাহিত করেন।

তাঁর প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় মুখের পক্ষাঘাত বিষয়ে পরে পাকস্থলীরস সম্পর্কে গবেষণা করে তিনি এম-ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

উচ্চ ডিগ্রীধারী হয়েও ডাঃ ক্লদ বার্নার্ড তাঁর পরীক্ষাগার ছেড়ে চিকিৎসা বিষয়ে লব্ধ জ্ঞানকে অর্থ উপার্জনের জন্য কোনদিন ব্যবহার করেন নি। উপরন্তু ১৮৪৪ সালে এনাটমি ও ফিজিওলজির সহকারী অধ্যাপক পদ গ্রহণ করে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গবেষণার কাজে নিয়োগ করেন! তখন তাঁর বয়স মাত্র একত্রিশ বছর।

এই সময় তাঁর দিন কেটেছে কঠিন ভাবে, দারুণ অর্থকষ্টে; কিন্তু বিজ্ঞান তাঁর বহুমুখী নিরলস সাধনায় বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিল।

ডাঃ বার্নার্ড ১৮৪৭ সালে কলেজ দ্য ফ্রান্সে অধ্যাপক ম্যাজেণ্ডির বদলি অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। এখানে তিনি পরীক্ষামূলক চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণার সূচনা করেন! তাঁর এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 'পরীক্ষামূলক চিকিৎসা বিজ্ঞান, যা আপনাদের শিক্ষা দেবার জন্য এসেছি, তার এখনও সৃষ্টি হয়নি। এখন শুধু ভিত্তিস্থাপন করে যেতে হবে এবং ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীরা তাকে রূপ দেবে। তার পরে শরীরতত্ত্ব বিজ্ঞান দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।'

ডাঃ বার্নার্ডের বহুদিনের সঞ্চিত চিন্তাধারা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে! বইটির নাম 'অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দ্য স্টাডি অব

একস্‌পেরিমেন্টাল মেডিসিন' (An Introduction to the Study of Experimental Medicine)। অবশ্য ইতিমধ্যে তাঁর বহু প্রবন্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সেই তিনি পর পর তিনবার একস্‌পেরিমেন্টাল ফিজিওলজির পুরস্কার লাভ-করেন এবং ফরাসী দেশের 'লিজিয়ন অব অনার এর রেড রিবন' পুরস্কার পান অগ্নাশয় (Pancreas) সম্বন্ধে গবেষণা করে। শরীরের মধ্যে চিনি কিভাবে সৃষ্টি হয়, সেটি তিনি পরীক্ষা করে দেখান। কুকুরের শিরায় চিনি ইনজেকশন করার পরে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়, কিন্তু চিনিকে পাকস্থলীর রসে কিছুক্ষণ রাখার পরে ইনজেকশন দিলে তা প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায় না।

লিভারে কি অবস্থায় চিনি থাকে সে বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে প্রাণীর রক্তে সব সময়েই কিছু চিনি থাকে। তিনি আরও দেখান যে প্রাণীর শরীরে জন্মের আগে থেকেই লিভারে চিনি তৈরী হয় এবং বহুমূত্র রোগীর মৃত্যুর পূর্বে প্রস্রাবে চিনি থাকে না এবং লিভারেও চিনি থাকে না।

ডাঃ বার্নার্ড মানুষের খাদ্য পরিপাক বিষয়েও গবেষণা করেছিলেন। পূর্বে চিকিৎসকদের ধারণা ছিল খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া পাকস্থলীতেই শেষ হয়। বার্নার্ড পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন যে অগ্নাশয়ের রস ছাড়া খাদ্যের স্নেহ জাতীয় পদার্থ ও কার্বোহাইড্রেট এর কিছু অংশের পরিপাক সমাপ্ত হয় না।

এই সব ছাড়া বার্নার্ড বহু বিষয়ে গবেষণা করেন। যথা—কুরারে (curare) কি ভাবে স্নায়ুর ওপর বিষ ক্রিয়া করে ; কার্বন মনোক্সাইড কি উপায়ে রক্ত কণিকায় মিশে প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়, কিডনিতে কোন স্নায়ু কি ভাবে কাজ করে, মস্তিষ্কের বিশেষ অংশের বিশেষ কাজ কেমন, লালাগ্রন্থির উপরে কোন স্নায়ুর কি কাজ—ইত্যাদি।

এ ছাড়া তিনি গলার দুপাশে যে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু আছে, তার একদিক কেটে প্রমাণ করলেন যে তার ফলে মুখের অন্যদিকের তাপ-

মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই কাজের জন্য তিনি একাডেমি অব সায়েন্স থেকে চতুর্থ ও শেষ বার পুরস্কার পেয়েছিলেন। এর পর তাঁকে পুরস্কার দাতা কমিটির সভাপতি মনোনীত করা হয়। বোধ হয় অন্য গবেষক-দের কিছু পুরস্কার পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য !

১৮৫৫ সালে অধ্যাপক ম্যাজেণ্ডির মৃত্যুর পর তাঁকে কলেজ দ্য ফ্রান্সের মেডিসিন-এর অধ্যাপক করা হয়। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁকে দুটি সুন্দর গবেষণাগার তৈরী করে দেন ; একটি সোর্বোর্ণে (Sourbourne), অপরটি ন্যাচারাল হিষ্টরি মিউজিয়মে। পরে এক রাজকীয় নির্দেশনামায় ১৮৬৯ সালে তিনি ফরাসী সেনেটের সদস্য মনোনীত হন।

ডাঃ বার্নার্ডের বিবাহিত জীবন কিন্তু সুখের ছিল না। তাঁর স্ত্রী প্রাণীর উপর পরীক্ষা করা নিষ্ঠুরতা বলে মনে করতেন। ১৮৭০ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়। এর পরেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। আসলে ১৮৬০ সালে পায়লোনেফ্রাইটিস (Phyelonepritis) কিডনিতে জীবাণু আক্রমণের ফলে ক্ষত ও পুঁজ সৃষ্টি) আক্রমণের পরে প্রায়ই তাঁর শরীর খারাপ হয়। শরীরের অসুস্থতার জন্য পরের গবেষণাগুলি আগের মত উচ্চস্তরের হয়নি।

১৮৭৮ সালে তাঁর জীবনের সমাপ্তি। তাঁর মৃত্যুর পরে, তাঁরই আবিষ্কারের সূত্র ধরে পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভুত উন্নতি করেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত প্রক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডের ভিতরে ক্যাথিটার দেবার প্রণালী বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। পরে ১৯২৯ সালে জার্মানীতে ওয়ার্নার ফরসম্যান বোধহয় তাঁর লেখা পড়ে নিজের হৃদপিণ্ডে ক্যাথিটার প্রবেশ করিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এই অধ্যায় শেষ করছি। তিনি লিখেছেন, বড় শিরার মধ্য দিয়ে ক্যাথিটার চালনা করলে, সেটি হৃদপিণ্ডের ভিতরে যাবে। হৃদপিণ্ডের ডানদিকে যাওয়া খুবই সহজ, তবে বাঁদিকে যাওয়া একটু কঠিন। হৃদপিণ্ডের ভিতরে ক্যাথিটার

পাঠাতে পারলে আমরা তার ভিতরের অবস্থা আরও ভাল ভাবে বুঝতে পারব।

আজ থেকে প্রায় একশ পনের বছর আগে তিনি এটা লিখে-ছিলেন। আর তিরিশ বছর আগে পৃথিবীতে নানা দেশে রোগ নির্ণয়ে সহায়ক হিসেবে হৃদপিণ্ডে ক্যাথিটার ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। জ্ঞানী লোকদের বিষয়ে প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে 'তাঁরা সময়ের আগে জন্মেছেন'। ডাঃ ক্লদ বার্নার্ড প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছা হয় যে 'তিনি সময়ের বহু আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন।'

কেমন করে হ'ল

রক্তচাপ মাপার যন্ত্র

কোন রোগীকে পরীক্ষা করতে হলে চিকিৎসকের যেমন স্টেথোস্কোপ দরকার হয় ; তেমনি আরও কয়েকটি যন্ত্র চিকিৎসকদের রোজই ব্যবহার করতে হয়, তার মধ্যে রক্ত চাপ মাপার যন্ত্র (Sphymomanometer) অন্যতম। যে অতি পরিচিত যন্ত্রটি এখন আমরা দেখতে পাই, তা কিন্তু একদিনে তৈরী হয় নি। বহু বছর ধরে নানাভাবে পরীক্ষা করে, কিছুটা রেখে, কিছু বর্জন করে, আবার হয়ত কিছুটা বদল করে, বহু লোকের পরিশ্রমের ফলে এই যন্ত্র আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

রক্তচাপ সঠিকভাবে জানার জন্য সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিলেন মিডলসেক্স-এর এক পাদরী। তাঁর নাম স্টিফেন হেলস্। তাঁর জন্ম ১৬৭৭ সালে। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি পদার্থবিদ্যা ও গণিতে উচ্চ শিক্ষালাভ করেন। তারপরে তিনি পাদরী হবার জন্য ধর্মশিক্ষা করেন।

মিডলসেক্স-এর গীর্জায় পাদরী হলেও এই কাজে তার কতটা আগ্রহ ছিল, তা এখন জানা যাবে না। তবে অজানাকে জানা, জীববিজ্ঞানের তত্ত্ব খুঁজে দেখার জন্য তাঁর অপরিসীম বাসনা ছিল।

কাজের অবসরে তিনি বসে থাকতে পারতেন না। মাথায় চিন্তা এলো হৃদপিণ্ড সঙ্কোচনের সময় ধমনীতে যে পার্শ্বচাপ সৃষ্টি হয়, তা কি মেপে দেখা সম্ভব।

যেই চিন্তা এলো, সেইমত কাজও আরম্ভ হোল। কাঁচের নল জোগাড় হোল। এক অংশ বেশ সরু, মাঝের অংশের ব্যস কমও নয়

আবার খুব বেশীও নয়। আর একটি কাঁচের টিউব যেটি দাগ কেটে কেটে সমান ভাগে ভাগ করা। এটি এক ধরনের ম্যানোমিটার। রেভারেণ্ড হেলস্ কাঁচের নলের ছুঁচোল দিকটা প্রাণীর ধমনীর ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন। রক্ত জোরে বাইরে এসে কাঁচের টিউবের মাঝের অংশে এল। এই টিউবের অপর প্রান্ত ম্যানোমিটার-এর সঙ্গে যোগ করা। রক্ত যখন ঐ ম্যানোমিটারে মধ্যে ঢুকে যেত, হেলস্ রক্তচাপ লক্ষ্য করে লিখে রাখতেন।

তবে এইভাবে রক্তচাপ দেখা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না। রেভারেণ্ড হেলসের পদ্ধতিতেএকটি ঘোড়ার রক্তচাপ মাপতে হলে কম-পক্ষে এগারো ফুট দীর্ঘ দাগ কাটা কাঁচের ম্যানোমিটার দরকার। কাগজে কলমে সম্ভব হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এটা তো সম্ভব নয়। সে সময়ের চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা রেভারেণ্ড হেলস্-এর কাজের কোন গুরুত্ব আছে বলে মনে করেন নি। কারণ রক্তচাপ যে কোন যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব, এই চিন্তা তখন কারো মাথায় আসে নি।

তবু রেভারেণ্ড হেলস্‌কে রক্তচাপ নিরুপণের ব্যাপারে পথ প্রদর্শক বলা যেতে পারে ; তার কারণ আগে আর কেউ কোন রোগে যে রক্ত-চাপের কম-বেশী হতে পারে সেকথা চিন্তা করেন নি। রেভারেণ্ড হেলস্ ১৭৬১ সালে পরলোক গমন করেন।

এরপরে প্রায় একশ' বছর কেটে গেল, রেভারেণ্ড হেলস্-'এর পরে আর কেউ রক্তচাপ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন নি। শেষে ১৮২৮ সালে এক ফরাসী শরীর বিজ্ঞানী লিওনার্ড ম্যারি পোয়কুলি দাগ কাটা ছোট কাঁচের টিউবের (manometer) ভিতরে পারদ ব্যবহার করেন। পারদ তরল পদার্থ, কিন্তু রক্তের চেয়ে ওজনে ভারী। রক্তচাপ পারদকে ঠেলে বেশী উঁচুতে তুলতে পারে না।

এর কয়েক বছর পরে ১৮৪৭ সালে কার্ল লাডউইগ রক্তচাপের রেকর্ড রাখার জন্য এক গোল ড্রামেরওপর মোটা কাগজে ভুষো কালির প্রলেপ লাগিয়ে রক্তচাপের গ্রাফ লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

কিন্তু রক্তের চাপ মাপার এইসব পদ্ধতিতে একটি বড় অসুবিধা ছিল, সেটি হোল ধমনীর ভিতরে সরু কাঁচের নল ঢুকিয়ে তবে রক্তচাপ মাপতে হোত। ১৮৮১ সালে স্যামুয়েল সীগফ্রিড বাহুর ধমনীর ওপর রবারের পটি বেঁধে রক্তচাপ নিরুপণের এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ঐ রবার পটি কনুই-'এর একটু ওপরে বেঁধে তার ভেতরে ধীরে ধীরে হাওয়া ঢুকিয়ে দেওয়া হোত, যতক্ষণ না হাতের কব্জির সামনের ধমনীতে স্পন্দনের অনুভূতি বন্ধ হয়। এই পদ্ধতিতে অনেক সময় ভুল হোত, সেইজন্য এটি পরিত্যক্ত হয়েছিল।

১৮৯৬ সালে স্কিপিওন রিভা-রেকিআজ যে ধরনের রক্তচাপ মাপার যন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে, প্রায় সেইরূপ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এতে ছিল দাগ কাটা কাঁচের ফাঁপা নল (ম্যানোমিটার), নীচে পারদ আধার, বাহুতে বাঁধার জন্য রবারের পটি, তার মধ্যে হাওয়া ঢোকাবার জন্য রবারের ছোট বল, রবারের টিউব প্রভৃতি সবই ছিল।

এখন রক্তচাপ মাপার জন্য যে পারদ যন্ত্র ব্যবহার হয়—সেটি ছিল মোটামুটি একই ধরনের। পারদ ছাড়া ঘড়ির আকারের রক্তচাপ মাপার যন্ত্র এখন খুব জনপ্রিয়—কারণ এটি আকারে ছোট, হালকা এবং বহন করে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ। এখন বিশ্বের ধনী দেশে ইলেকট্রনিক স্ফিগমোম্যানোমিটার ব্যবহার হচ্ছে।

থার্মোমিটার

জ্বর হলে সঠিকভাবে শরীরের তাপ নির্ণয় করার জন্য যে অত্যন্ত সাধারণ যন্ত্রটি আমরা ব্যবহার করি, তার নাম 'থার্মোমিটার'। এর ব্যবহার কেবল ডাক্তার বা নার্সের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বাড়ীতে কারো জ্বর হলে রোগীর আত্মীয়রা এটি প্রয়োজন মত ব্যবহার করেন। এই থার্মোমিটার কেবলমাত্র চিকিৎসকের কাছে নয়, প্রতি

ঘরে এক অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। ছোট্ট এই যন্ত্রটি যা আমরা আজ ব্যবহার করি, সেটিও কিন্তু একদিনে হয়নি। অনেক বছর লেগেছে জ্বর মাপার যন্ত্রটি আবিষ্কার করতে।

মানুষের জ্বর সঠিকভাবে নির্ণয় করতে যে যন্ত্রের সাহায্য দরকার হবে, তা বহুবছর আগে সর্বপ্রথম অনুমান করেছিলেন একজন ইতালীয় চিকিৎসক, যার নাম স্যাংটোরিয়াস—১৫২২ সালে। কিন্তু ১৮০০ সাল পর্যন্ত সঠিক ভাবে জ্বর নির্ণয় করাকে আর কোন চিকিৎসক গুরুত্ব দেন নি। খুব কম চিকিৎসক থার্মোমিটার ব্যবহার করতেন, আর জ্বরের গতি-প্রকৃতি লিখে রাখার তো কথাই নেই। এর কোন গুরুত্ব থাকতে পারে, তা কেউ ভাবতেই পারেন নি।

১৮৪৮ সালে জার্মানীর লিপজিগে'র এক অধ্যাপক তাঁর রোগীদের জ্বর দেখে লিখে রাখতে আরম্ভ করলেন। ধৈর্য্য ধরে বিশদভাবে লিখে রাখলেন, কোন অসুখে কেমন জ্বর হয়। কখন আসে, কখন যায়। শীত করে আসে, না ঘাম হয়। অল্পদিন নয়, দীর্ঘ কুড়ি বছর তিনি এইভাবে লিখে, জার্মান ভাষায় তাঁর তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। তিন বছর পরে এই মূল্যবান প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হোল।

এরপরে ১৮৫৩ সালে এক খ্যাতি সম্পন্ন ইংরাজ অধ্যাপক স্যার টমাস্ এলবার্ট সঠিক জ্বর নির্ণয়ের গুরুত্ব বুঝতে পেরে, তাঁর নিজের রোগীদের জন্য একটি থার্মোমিটার ব্যবহার করতেন। কিন্তু সেই থার্মোমিটার ছিল দশ ইঞ্চি লম্বা। স্যার টমাস্ নিজেই উপহাস করে তাঁর থার্মোমিটারকে বলতেন 'ছাতার বাঁট'। ১৮৬৭ সালে তিনি এক ধরনের ছোট থার্মোমিটার তৈরী করেছিলেন, কিন্তু সেটিও ছিল ছয় ইঞ্চি লম্বা, আর জ্বর উঠতে সময় নিত পাঁচ মিনিট। আরও পরে তিনি এর চেয়ে উন্নত ধরনের থার্মোমিটার তৈরী করেছিলেন! এটি মাত্র তিন ইঞ্চি লম্বা, যে আকারের থার্মোমিটার আমরা ঘরে বাইরে সবখানে ব্যবহার করছি।

ইনজেকশন সিরিঞ্জ

ডাক্তারবাবু বাড়ীতে এলেই শিশুরা ভয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়, ডাক্তারের কাছে আসতে চায় না। কেন? ভয়! কিসের ভয়? ইনজেকশন দেবার ভয়।

এ ঘটনা আমাদের সকলের চোখে পড়েছে। আজ ডাক্তারের হাতে যেমন স্টেথসস্কোপ, রক্তচাপ মাপার যন্ত্র, টর্চ, থার্মোমিটার থাকে তেমনি অপরিহার্য ইনজেকশন দেবার পিচকারী ও আপদকালীন চিকিৎসার জন্য কিছু ওষুধ।

গত শতাব্দীর পরে যেমন একের পর এক নতুন ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে, তেমনি পরিবর্তন হয়েছে তার প্রয়োগ পদ্ধতি। ওষুধ খাওয়ানো ছাড়া, প্রলেপ দেওয়া, নাকে মুখে ভাপ নেওয়া প্রভৃতি পুরানো পদ্ধতির পরে এলো চামড়ার নীচে পেশীর মধ্যে অথবা শিরার ভিতরে ওষুধ প্রয়োগ। কিন্তু তার জন্যে চাই বিশেষ ধরনের যন্ত্র— ভিতরটা হবে ফাঁপা; যার মধ্যে ভরা যাবে তরল ওষুধ। একটি পিস্টনের সাহায্যে চাপ দিলে, সামনের দিকে লাগান ফাঁপা সূঁচের মধ্য দিয়ে ঐ ওষুধ শরীরের ভিতরে যাবে। এইভাবে ওষুধ ব্যবহার করতে পারলে, তার ফল তাড়াতাড়ি পাওয়া সম্ভব।

ইনজেকশন দেওয়ার এই যন্ত্রটি কে আবিষ্কার করেছিলেন তা নিয়ে কিন্তু বিতর্কের অবকাশ আছে। বহুদিন এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে ফরাসী শল্যবিদ ডাঃ প্রাভাজ ১৮৫৩ সালে ইনজেকশন দেওয়ার সিরিঞ্জ আবিষ্কার করেছেন। ঘটনাটি কিন্তু ঠিক তা নয়। ডাঃ প্রাভাজ কোন রোগীকে ঐ যন্ত্রের সাহায্যে ইনজেক্শন দেন নি, আর তিনি নিজেও কোনদিন যন্ত্র আবিষ্কারের কৃতিত্ব দাবী করেন নি। তবে তিনি পরীক্ষামূলক ভাবে জন্তুর শিরায় এর দ্বারা ইনজেকশন দিয়েছিলেন।

মানুষের শরীরে ইনজেকশন দ্বারা ওষুধ প্রয়োগের কৃতিত্ব দাবী

করতে পারেন এডিনবরা'র ডাঃ আলেকজাণ্ডার উড। ১৮৫৩ সালে তিনি প্রথম এই প্রক্রিয়ায় ওষুধ প্রয়োগ করেন এবং ১৮৫৫ সালে তিনি এই বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

চার বছর পরে ইনজেকশন চিকিৎসা প্রচলনের কৃতিত্ব দাবী করে আর একজন এগিয়ে এলেন তাঁর নাম চার্লস হান্টার। তাঁর দাবী কিন্তু কেউ মেনে নেয়নি ; তবে তিনি নিজের প্রচেষ্টায় এই পদ্ধতি জনপ্রিয় করতে খুব সাহায্য করেছিলেন।

ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম

ই-সি-জি (E.C.G) এমন তিনটি শব্দ যা আজ অল্প লেখাপড়া জানা লোকের কাছেও যথেষ্ট পরিচিত। হয়তো পুরো কথাটা তাদের জানা নেই, কিন্তু এটা কি কাজে ব্যবহার হয় সেটা তারা জানে।

ই-সি-জি অক্ষর তিনটি একটি যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত নাম। সেই যন্ত্রটির নাম ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ। কে কবে এই সংক্ষিপ্ত নামকরণ করেছিলেন তা কারো জানা নেই। লোকের মুখে মুখে প্রচার হয়ে এই নাম স্থায়িত্ব পেয়েছে।

এই যন্ত্র আবিষ্কারের ইতিহাস কিন্তু বেশ দীর্ঘ! এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ইতিহাস। অনেক বছর আগে ১৭৯২ সালে ইতালীতে বোলোনা (Bolougna) শহরে লুইজি গ্যালভানির বাড়িতে দৈবক্রমে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। গ্যালভানি তখন বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। ঘটনাটি ছিল এইরূপ—একটি সদ্যমৃত ব্যাঙ-এর পেশী লবণ জলে ভিজিয়ে টানা লম্বা তারে ঝুলিয়ে রাখা ছিল। নিচের আর একটি তামার তার টানা ছিল। বাতাসে দুলে ঐ পেশী তামার তার স্পর্শ করতেই পেশী কাঁপতে থাকল। ব্যাপারটা খুব আশ্চর্যজনক মনে হয়েছিল গ্যালভানির। মরা ব্যাঙ-এর পেশী

কাঁপবে কেন? তামার তারে কি এমন থাকতে পারে যার ছোঁয়া লেগে মরা পেশী কেঁপে উঠছে? পরে তিনি বুঝলেন তামার তার স্পর্শ করার সময় লবণ জলে ভেজান পেশীতে বিদ্যুৎ সঞ্চারের জন্য এই সঙ্কোচন।

কিন্তু গ্যালভানির এই তথ্যের গুরুত্ব যে কত বেশী তা সেই সময়ে কেউ বুঝতে পারেন নি এবং সেই কারণে অন্য কেউ আর এই বিষয়ে গবেষণা করতে এগিয়ে আসেন নি।

তবে একটা প্রশ্ন থেকে গেল যার উত্তর তখন পাওয়া গেল না। যে পেশীতে ঐ সঙ্কোচন ঘটেছিল, সেটি ছিল ঐচ্ছিক পেশী (Voluntary muscle)। কিন্তু শরীরে তো কিছু অনৈচ্ছিক পেশী আছে, যেমন হৃদপিণ্ডের পেশী (Involuntary muscle), বিদ্যুৎ সঞ্চারে তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হবে কি না? প্রশ্ন উঠলো ঐচ্ছিক পেশী সঙ্কোচনে যেমন বিদ্যুৎ সঞ্চার হয় হৃদপিণ্ডের অনৈচ্ছিক পেশীর প্রসার ও সঙ্কোচনের সময়ে কি অনুরূপ ভাবে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়?

প্রশ্নের উত্তর এলো অনেক বছর পরে ১৮৫৮ সালে। ঐ সময় কলিকার ও জোহানেসমুলার নামে দু'জন বিজ্ঞানী ব্যাঙ-এর হৃদপিণ্ডে তার সংযোগ করে গ্যালভানোমিটার' এর (গ্যালভানি'র তৈরী করা বিদ্যুৎ-এর মাত্রা মাপার যন্ত্র) কাঁটা সরিয়ে প্রমাণ করেছিলেন হৃদপিণ্ডের পেশীও সঙ্কোচনের সময় বিদ্যুৎ সঞ্চার করে।

আরও বছর তিরিশ পরে ১৮৮৯ সালে ওয়েলার সর্বপ্রথম মানুষের হৃদপিণ্ডের স্পন্দনের সময় বিদ্যুৎ সঞ্চারের কথা প্রকাশ করেন। এর দু'বছর আগে তিনি খরগোসের বুকের পেশী কেটে হৃদপিণ্ডে ইলেকট্রোড লাগিয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চার হতে দেখেছিলেন এবং সেই তথ্য সাধারণের কাছে প্রকাশ করেছিলেন।

ঐ সময়ে ওয়েলার ই-সি-জি নিয়ে প্রাথমিক স্তরে কাজ আরম্ভ করেন। তখন ই-সি-জি করা হোত ক্যাপিলারী ইলেকট্রোমিটার দিয়ে। কাচের ঐ ক্যাপিলারী টিউব দাঁড় করিয়ে রাখা হোত। ভিতরে এক

প্রান্তে থাকত পারদ, অপর প্রান্তে ডাইল্যুট সালফিউরিক এ্যাসিড। ইলেকট্রোমিটারের দুই প্রান্তে থাকত দুটি ইলেকট্রোড, যা শরীরে বুকে—পিঠে পরীক্ষার সময়ে লাগান হোত। বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ পার্থক্যের জন্য পারদের মাত্রা ওঠা নামা করত। তবে সেই মাত্রা এতই কম যে তা ম্যাগনিফাইং কাচের মধ্য দিয়ে দেখলে তবে বোঝা যেত। ইলেকট্রোমিটারের পাশে আলোক অনুভূতি (Light sensitive) গ্রহণ করতে পারে এইরূপ এক প্লেটের ওপর বড় করে পারদের ওঠা নামার ছাপ তুলে নেওয়া হোত। সেই সময়ে যান্ত্রিক উন্নতি বিশেষ কিছুই ছিল না। ফোটোগ্রাফির অবস্থাও ছিল আদিম স্তরে; সেইজন্য হৃদপিণ্ডের স্পন্দনের সময় যে বৈদ্যুতিক তারতম্য হয়, তা ভালভাবে কাগজে লিপিবদ্ধ করে রাখা সম্ভব হয়নি।

এরপরে ১৯০৩ সালে আসরে এলেন উইলহেল্‌ম্‌ আইনথোভেন নামে এক জার্মান বিজ্ঞানী। তিনি খুব পাতলা এবং ছোট্ট স্ফটিক খণ্ডে সোনার পাত মুড়ে চৌম্বক থেকে (Magnetic field) খুব সরু প্লাটিনামের তার দিয়ে ঝুলিয়ে রাখলেন। তারটি এমনভাবে ঝোলানো রইল যাতে সেটি খুব সহজেই নড়তে পারে। ক্ষেত্রের চুম্বক দুটির মধ্য দিয়ে এক সরু ছিদ্রপথ ছিল। ছিদ্রপথের একদিকে আলো এবং অপর দিকে ফটো প্লেট। আলো জ্বললে তার রেখা চুম্বক দুটির ছিদ্রপথ দিয়ে ফটো প্লেটের ওপর পড়ে।

প্লাটিনাম তারের অন্য দুইদিকে বুকের চামড়ায়, হাতে, পায়ে লাগান হয়। হৃদপিণ্ড সঙ্কোচনের সময়ে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয় তা শরীরের সব অংশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রবাহ প্লাটিনাম তারে প্রতিফলিত হয় এবং তারটি চৌম্বকক্ষেত্রে কাঁপতে থাকে। এর ফলে আলোর রেখাও বাধা পায় এবং তার ছাপ পড়ে ঐ ফোটো প্লেটের ওপরে।

খুবই জটিল ছিল সেদিনের ই-সি-জি করার ঐ যন্ত্র। এরপর আলো ও প্লেট বাতিল করে গ্যালভ্যানোমিটার তারে জুড়ে দেওয়া

হোল খুব সরু লেখনি—যা গ্রাফ কাগজের ওপর আঁক কেটে বুঝিয়ে দেবে হৃদপিণ্ড কেমন চলছে।

তারপর দিনে দিনে আরও উন্নতি হল ই-সি-জি যন্ত্রের। এই যন্ত্র আজ এমন অবস্থায় এসেছে যে দরকার পড়লে চিকিৎসক, সেবিকা অথবা টেকনিশিয়ান রোগীর বাড়ীতে, তার বিছানার পাশে গ্রাফ কাগজে তার হৃদ্‌স্পন্দনের রেখাচিত্র তুলে নিতে পারেন। ই-সি-জি যন্ত্র এখন ব্যাটারীর সাহায্যেও চালানো যায়। রোগীর ডান ও বাম বাহু, বাম পায়ে ছোট্ট বেল্ট দিয়ে তার বেঁধে এবং বুকে হৃদপিণ্ডের উপরে চামড়ায় বিশেষ ছয়টি স্থানে তার সংযোগ করে মিনিট দশের ভিতর সরু গ্রাফ কাগজের (যার গতি প্রতি মিনিটে ২৫ মিলিমিটার) উপরে হৃদ্‌স্পন্দনের রেখাচিত্র ঐ যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত সরু লেখনীর সাহায্যে তুলে নিয়ে রোগীর হৃদপিণ্ডে কি ধরনের অসুখ তা খুব তাড়াতাড়ি নির্ণয় করতে পারেন।

এই যন্ত্রের সাহায্যে আমরা হৃদ্‌পিণ্ডের গতি দ্রুত বা ধীর স্বাভাবিক তালে চলছে না তালভঙ্গ হয়েছে, হৃদপিণ্ডের ডান বা বামদিকের পেশী অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়েছে কিনা, করোনারী ধমনীর (যে ধমনী হৃদপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ করে) রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়েছে কিনা এবং স্পন্দনের পরিমিতি কম না বেশী, প্রভৃতি তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। আগে অবশ্য এই সব তথ্য জানতে হোত রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করে, এবং স্টেথোসস্কোপ বা শ্রুতি যন্ত্রের (Stethoscope) সাহায্যে। তবে তাতে ভুল হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। একজনের বোঝা তথ্যের সঙ্গে, অন্যের মত পার্থক্য হতে পারে। যন্ত্রের সাহায্যে তথ্য আহরণ করলে সেই সম্ভাবনা কম হবে।

এখন দেশের কয়েকটি বড় হাসপাতালে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে ই-সি-জি যন্ত্রের সাহায্যে রোগীর হৃদস্পন্দন দেখার ব্যবস্থা হয়েছে; একে বলা হয় অবিরাম মনিটর পদ্ধতি। তাছাড়া শরীরে ই-সি-জি যন্ত্রের তার লাগান অবস্থায় রোগী চলাফেরা, হাল্‌কা কাজ করবে এবং এই

পরিশ্রম হৃদপিণ্ডের ওপর কত চাপ পড়ছে তা পরিমাপ করা সম্ভব। একে বলা হয় হল্টার মনিটর পদ্ধতি।

এখন মনিটার পদ্ধতির সাহায্যে দূরে বা অন্য কোন ঘরে বসে চিকিৎসক বা সেবিকা টেলিভিশন পর্দায় চোখ রেখে রোগীর ওপর নজর করতে পারেন।

হৃদপিণ্ডে ক্যাথিটার চালনা

এত খবর এনেও কিন্তু ই-সি-জি হৃদপিণ্ডের খবর দিতে পারে না। যেমন, হৃদ্‌পিণ্ডের বাম ও ডান অংশের মধ্যে যে দেওয়াল, তাতে কোন ছিদ্র আছে কিনা, মাতৃ জঠরে থাকার সময় ডান ও বাম অলিন্দের মাঝের দেওয়ালে একটি ছিদ্র থাকে; জন্মের পর প্রায় সব শিশুর ঐ ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অল্প কয়েকজনের ঐ ছিদ্র থেকে যেতে পারে। তেমনি বাম ও ডান নিলয়ের মধ্যে জন্মের সময় ছিদ্র থাকতে পারে, যা স্বাভাবিক ক্ষেত্রে দেখা যায় না। অনেক সময় জন্মের পরে শিশুকে পরীক্ষা করে ঐ দোষ ধরা পড়ে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই অস্বাভাবিক অবস্থা অনেক দেরীতে ধরা পড়ে।

তবে এক সদ্য পাশ করা চিকিৎসকের খেয়ালী কাজের দ্বারা এটি এখন খুব সহজে জানা সম্ভব হয়েছে। এখন ঐ তরুণ চিকিৎসকের খাম খেয়ালী কাজের ব্যবহারিক প্রয়োগ চিকিৎসার কাজেও লাগছে এবং অচল হৃদপিণ্ডকে সচল রাখতে সাহায্য করে বহু লোকের জীবন রক্ষা করেছে।

হৃদপিণ্ডের স্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে একটি ছোট বড়ি আকারের তন্তু-কোষ—যার নাম সাইনো-এট্রিয়াল নোড (S.A.Node)। সেখানে স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে, বিশেষ পথ ধরে হৃদ্‌পিণ্ডের পেশীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে হৃদপিণ্ডের পেশীসমূহ একটি ধরা বাঁধা নিয়মে সঙ্কোচিত হয়। কোন কোন রোগে এই নোডের অসুখে অথবা স্পন্দন

তরঙ্গ যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি হয় এবং এই হৃদ্‌পিণ্ড তখন চলে মিনিটে চল্লিশের কাছাকাছি। হৃদপিণ্ডের গতি আবার স্বাভাবিক করা যায় যদি কৃত্রিম উপায়ে স্পন্দন তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়। পেসমেকার (Pace Maker) এমনি এক যন্ত্র! বুকের চামড়া অল্পকেটে, পেশীর নিচে এটিকে বসিয়ে তারের সাহায্যে সাইনো এট্রিয়াল নোড থেকে স্পন্দন তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয় মিনিটে ৭০—৭২ বার। একটি ছোট অপারেশন করে 'পেসমেকার' বসান হয় তবে রোগী যখন গুরুতর অসুস্থ, তখন অজ্ঞান করে অপারেশনের সময় বিপদের সম্ভাবনা। সেই অবস্থায় বাহুর শিরার মধ্যে দিয়ে 'পেস মেকার' ইলেকট্রোডের তার চালান হয়। পরে রোগী সুস্থ হয়ে উঠলে পাকাপাকি ভাবে 'পেস-মেকার' বসান হয়।

যে তরুণ চিকিৎসকের কাজের দ্বারা হৃদ্‌পিণ্ডের রোগ নির্ণয় বা 'পেসমেকার' বসান চিকিৎসা সম্ভব হয়েছে তার নাম ওয়ার্নার ফ্রসম্যান। তিনি একজন জার্মান নাগরিক! ১৯১৯ সালে যখন তার বয়স মাত্র পঁচিশ বছর, একদিন খেয়ালের বশে নিজের হাতের শিরা ফুটো করে তিনি সিল্কের সরু পাকান সুতো শিরার মধ্যে চালিয়ে দিলেন। ছোট শিরা থেকে বড় শিরায় গেল, কোন বাধা নেই। তিনি ঠেলে চলেছেন। আরও মোটা শিরা দিয়ে কাঁধের কাছে খুব বড় শিরায় গেল। সেখান থেকে গলার নিচের দিকে প্রধান শিরা দিয়ে হৃদ্‌পিণ্ডের ডান দিকে পৌঁছে গেল। তার পরে আর যেতে চায় না, আটকে গেল।

স্বস্তি পেলেন ফ্রসম্যান, তাহলে তাঁর ধারণা ঠিক। ছুটে চললেন ওপর তলায়। সবুর সয়না। একটা সিঁড়ির ধাপ বাদ দিয়ে দৌড়ে ওপরে গেলেন ফ্রসম্যান একেবারে যে ঘরে একস-রে হয়, সেখানে। নিজের বুকের, হাতের একস্‌-রে করালেন তিনি। ছবিতে দেখা গেল সিল্কের সুতো দিব্যি পাক্‌ খেয়ে হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে গুটিয়ে রয়েছে। এরজন্যে তাঁর শরীরে কিন্তু কোন খারাপ অনুভূতি নেই।

তিনি তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা চিকিৎসা পত্রিকায় প্রকাশ



ওয়ার্নার ফ্রসম্যান

করলেন। সেই একস-রে ছবিগুলো প্রকাশ করলেন প্রমাণ হিসাবে। কিন্তু এই কাজের জন্যে কোন লোক তাকে বাহবা দিল না; উল্টে বলল তিনি পাগল ও ছিটগ্রস্থ।

এরপর অনেক বছর পার হয়ে গেল। ফ্রসম্যানের কথা বোধ হয় লোকের আর মনে নেই। না, দু'জন লোক ভোলেনি। সেই আধপাগল, ছিটগ্রস্থের লেখা প্রবন্ধ পড়ে অদ্রেঁ কর্নান্দ ও ডিকিনসন রিকার্ডস (ছোট) বোধহয় নতুন পথের নিশানা পেলেন। উৎসাহ নিয়ে দীর্ঘ দশটি বছর চেষ্টার পরে হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে ক্যাথিটার প্রবেশ করানোর নিরাপদ পদ্ধতি এবং এর দ্বারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কি লাভ হতে পারে সে বিষয়ে তাঁর বিশদভাবে বর্ণনা করেন। তখন সকলে

বুঝল ফ্রসম্যানের আবিষ্কারের গুরুত্ব কোথায়। আর দীর্ঘ সাতাশ বছর পরে সেই ছিটগ্রস্থ, চিকিৎসক সমাজে উপেক্ষিত ফ্রসম্যান ও তুই আমেরিকান চিকিৎসক কর্নান্দ ও রিকার্ডস (ছোট) একযোগে হৃদপিণ্ডে ক্যাথিটার প্রবেশ করার পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন!

আলট্রাসনোগ্রাফি

যখন কর্নান্দ ও রিকার্ডস হৃদ্‌পিণ্ডে ক্যাথিটার চালান নিয়ে নানা ভাবে পরীক্ষা করছিলেন, তখন আর একদল বিজ্ঞানী রোগ নির্ণয়ের জন্য উন্নততর ও নিরাপদ পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগ নানাভাবে পরীক্ষা ও গবেষণা করছিলেন। কারণ, ১৮৯৫ সালে আবিষ্কৃত এক্স-রে তখন প্রবীণত্ব অর্জন করেছে! আর অভিজ্ঞতা দিয়ে লোক জেনেছে যে এক্স-রে তার অদৃশ্য রশ্মি বিকিরণ করে আমাদের শরীরে ও মানব গর্ভে ভ্রূণের ক্ষতি করতে পারে।

সেই কারণে রোগ নির্ণয়ে আরও নিরাপদ পদ্ধতির প্রয়োজনে আলট্রাসনোগ্রাফি গবেষণার আরম্ভ। এই মতবাদের ভিত্তি ছিল এইরূপ ঃ শরীরের কোন অংশে প্রোব বসিয়ে যদি অতি দ্রুতহারে কম্পন সৃষ্টি করা হয়, সেই কম্পন তরঙ্গ শরীরের ভিতরে ঐ অংশের শেষ পর্যন্ত গিয়ে আবার তরঙ্গ আকারে খবর নিয়ে ফিরে আসে।

আলট্রাসনোগ্রাফি শরীরের বহু খবর আনতে পারে বটে, কিন্তু বুকের পাঁজরা বাধা সৃষ্টি করার জন্য ফুসফুসে রোগ নির্ণয়ে এই পদ্ধতি ব্যর্থ। হৃদ্‌পিণ্ডের এলাকা খুব ছোট, সেখানে ব্যবহার হয় 'ইকোকার্ডিওগ্রাফি ; যেটি আসলে আলট্রাসনোগ্রাফির রকমফের।

ইকোকার্ডিওগ্রাফি'র সর্বপ্রথম ব্যবহারিক প্রয়োগ হয় ১৯৩৫ সালে। ঐ সময় এডলার ও হার্জ নামে তুই বিজ্ঞানী হৃদ্‌পিণ্ডে মাইট্রাল ভালভ' এর (বাম অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যের ভালভ) রোগ নির্ণয়ে

ইকোকর্ডি ও গ্রাফি'র গুরুত্ব কতখানি তা সকলকে দেখালেন। এই পদ্ধতিতে সহজেই জানা গেল 'মাইট্রাল ভালভ' এর গর্ত স্বাভাবিক না ছোট, ভালভ' এর কপাটগুলি কেমন কাজ করছে, কপাট দুটি ঠিক মত একসঙ্গে বন্ধ হচ্ছে কিনা, কপাট মোটা হয়েছে কিনা, বন্ধ হওয়ার পরে ফাঁক থাকছে কি না। এমন গর্তের মুখ কত মিলিমিটার, ছোট হয়েছে না স্বাভাবিক অবস্থায় আছে তাও মেপে দেখা সম্ভব হোল।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হোল এই-যে এডলার ও হাজের গবেষণার বিবরণ জানার পরেও দশ বছর এই ব্যাপার নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাল না। ১৯৬৫ সালে অর্থাৎ প্রায় একযুগ পরে এইচ ফাইজেনবম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সামনে প্রমাণ করলেন যে হৃদ্‌পিণ্ডের আচ্ছাদিকা (পেরিকাডিয়াম) পর্দার মধ্যে যদি খুব সামান্য পরিমাণে জলীয় পদার্থ জমে, তা অন্য কোন উপায়ে ধরা না গেলেও ইকোকার্ডিওগ্রাফি দ্বারা জানা যাবে।

এর পরের দশ বছর ইকোকার্ডিওগ্রাফি নিয়ে বহু গবেষক গবেষণা করেন। তাঁদের অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে জানা গেল, শুধু মাইট্রাল ভালব নয়, অন্য ভালভ সমূহ হৃদপিণ্ডের পেশী, গহ্বর ও তার মধ্যের দেওয়াল সবেরই রহস্যদ্বার আজ আমাদের চোখের সামনে খুলে গেছে। এমনকি এট্রিয়াম গহ্বরের মধ্যে মিক্সোমা (Myxoma) শ্রেণীর টিউমারও এই যন্ত্র দ্বারা ধরা পড়ে।

ইকোকার্ডিওগ্রাফির বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি কিন্তু 'আলট্রাসাউণ্ড' বা 'অতি-শব্দ।' এই আলট্রাসাউণ্ড হল অতি দ্রুত উচ্চকম্পন। এটা যে মানুষের উপকারে লাগতে পারে, এই ধারণা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে।

গত বিশ্বযুদ্ধে প্রচুর সংখ্যায় সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ ব্যবহার হয়েছিল। সেই সময়ের একটা ঘটনা কল্পনা করা যাক। আতলান্তিক মহাসাগরে কোন এক জায়গা দিয়ে ডুবোজাহাজ চলেছে ধীরে ধীরে তার শিকারের খোঁজে। কিন্তু হঠাৎ সে নিজেই শিকার হয়ে গেল।

হয়ত মাইল পাঁচ দূরে এক ধ্বংসী জাহাজ (Destroyer) এই ডুবো-জাহাজের অবস্থিতি জানতে পেরে, গুটি গুটি কিছুটা এগিয়ে এসে ডেপথ চার্জ (Depth Charge) মারল তাকে লক্ষ্য করে। সমস্ত নাবিক সহ সেই ডুবোজাহাজটির সলিল সমাধি হল।

এ ধরনের ঘটনা গত বিশ্বযুদ্ধে হয়েছে প্রচুর,—দু' দশটা নয়, শতশত ডুবোজাহাজ ডেপথ চার্জ বা মুখোমুখি লড়াই-এ মরেছে। আমাদের প্রিয় নেতাজী এই রকম একটি ডুবোজাহাজে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইউরোপ থেকে জাপান পাড়ি দিয়েছিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন হোল যে ডুবোজাহাজ যখন জলের নীচে থাকে, ধ্বংসী জাহাজ বা অন্য জাহাজ কিভাবে জানতে পারে যে কাছে-পিঠে কোথাও ডুবোজাহাজ আছে?

আমরা জানি যে কোন যন্ত্র যখন চালু থাকে, তখন একটা কম্পন সৃষ্টি হয়। সেটা বেশী হতে পারে অথবা কমও হতে পারে। ডুবো জাহাজের অবস্থিতি জানবার জন্য যন্ত্রের সাহায্যে জলের নীচে কম্পন মাত্রা নির্ণয়ের ব্যবস্থা হোল—শব্দের প্রতিধ্বনির মাত্রা (frequency) নিরুপণ করে। আমরা জানি সাধারণ শব্দ যা আমরা কানে শুনতে পাই বা অনুভব করি, তার কম্পন প্রতি সেকেণ্ডে ২০,০০০ বারের কম। সেকেণ্ডে এর চেয়ে বেশী কম্পন হলে তাকে বলা হয় আলট্রা-সাউণ্ড বা অতিশব্দ। এই কম্পন অতি দ্রুত মাত্রায় হওয়ার জন্য, তা আমাদের শ্রুতি ও অনুভূতির বাইরে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে অতিশব্দ ব্যবহার হয় তার কম্পন মাত্রা সেকেণ্ডে দশলক্ষ থেকে একশ লক্ষ পর্যন্ত হতে পারে।

অতিশব্দ বা আলট্রাসাউণ্ড প্রস্তুত হয় কোন স্ফটিকের (Quartz) ওপর চাপ সৃষ্টি করে। শরীরের যে অংশের ওপর পরীক্ষা করার দরকার, সেখানে এক বিশেষ ধরনের জেলী লাগান হয়। তারপরে সেখানে একটি প্রোব (probe) স্থাপন করা হয় এবং ট্রান্সমিটার থেকে বৈদ্যুতিকে প্রবাহ চালু করা হলে অতিশব্দ সৃষ্টি হয়। প্রোবের মধ্যে

দিয়ে প্রবেশ করে অতিশব্দ বিশেষ টিস্যু বা কোষ তন্তুজাল পর্যন্ত, যায় এবং তার কিছু অংশ ফিরে আসে প্রতিধ্বনি হয়ে ! এই প্রতিধ্বনি ধরা পড়ে ট্রান্সডিউসারে। একের পর এক প্রতিধ্বনি ফিরে আসে আর জমা হয় এবং একটা হাতপাখার মত রূপ নেয়।

এই প্রতিধ্বনি যে অঙ্গ থেকে ফিরে আসে, তার আকার বা বিকৃতি সম্বন্ধে আমরা আভাস পাই। যদি দেখা যায় সুস্থ ও স্বাভাবিক টিস্যুর সঙ্গে কোন একজনের টিস্যুর ঘনত্ব পৃথক, তখন আমরা বুঝতে পারি যে দ্বিতীয়জনের টিস্যু স্বাভাবিক নয়, হয়ত অসুস্থ।

এখন বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে অতিশব্দ পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয় জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কারণ অভিজ্ঞতা থেকে আজ আমরা জেনেছি যে একস্-রে দ্বারা রোগ নির্ণয় সব সময় নিরাপদ নয়। রোগ নির্ণয়ে একস-রে খুব বেশীবার ব্যবহার করলে শরীরের ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া গর্ভবতী মায়ের শরীরে একস্-রে করলে মাতৃজঠরে শিশুর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে শিশু লিউকোমিয়া রোগগ্রস্থ বা বিকলাঙ্গ হতে পারে।

এই সব বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেওয়াতে চিকিৎসকরা একস্-রে করার ব্যাপারে সাবধান হলেন। বিশেষ দরকার না হলে রোগীদের, বিশেষ করে গর্ভবতী রোগীদের একস্-রে করার-প্রবণতা কমে গেছে। কিন্তু এমন সময়ও তো আসে, যখন একস্-রে না করলে চলে না। এ অবস্থায় কি করা যাবে ?

ভাবনা দূর হোল এই অতিশব্দ পদ্ধতি প্রয়োগে সুইডেনের আই এডলার ও সি-এইচ হার্জ এর আবিষ্কৃত ইকোকার্ডিগ্রাফি'র থেকে বৈজ্ঞানিকরা একটু রদবদল করে চিকিৎসকের উপহার দিলেন এই অতিশব্দ পদ্ধতি বা আলট্রাসনোগ্রাফি।

অতিশব্দ পদ্ধতি খুব নিরাপদ ; বহু রোগ নির্ণয়ে এর সাহায্য আমরা নিতে পারি। যেমন আগেই বলা হয়েছে মাতৃজঠরে ভ্রূণের অবস্থিতি কেমন, বেঁচে আছে কিনা, যমজ কিনা বা বিকলাঙ্গ হয়েছে

কিনা, ইত্যাদি। তাছাড়া পেটের ভিতরে কোথাও পেকে গিয়ে পুঁজ হয়েছে কিনা, সেটাও খুব সহজে জানা সম্ভব হয়েছে। শরীরের অন্য অংশ যেমন চোখ, থাইরয়েড গ্রন্থি, লিভার, প্লীহা, পিত্তথলী, কিডনি, প্রধান ধমনী এওরটা, প্রধান শিরা ইনফিরিয়ার ভেনাকেডা ও আরও যন্ত্রের অবস্থা বিনা অপারেশনে ও বিনা একস্-রে'তে জানা সম্ভব হয়েছে অতিশব্দ পদ্ধতি প্রয়োগে।

শুধু রোগ নির্ণয় বা বলি কেন! চিকিৎসার ব্যাপারেও অতিশব্দ পদ্ধতি এখন প্রয়োগ করা হচ্ছে। ফিকিওথেরাপী ও দাঁতের ড্রিলিং পদ্ধতিতে চিকিৎসায় এর কার্যকারিতা প্রনাণিত। অতিশব্দ পদ্ধতি জলের ভিতর বুদবুদ সৃষ্টি করতে পারে এবং এর দ্বারা শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি শোধন করা ও নির্বীজন করা যেতে পারে।

তবে এই যন্ত্রের দাম এত বেশী যে আমাদের মত দরিদ্র ও উন্নতি শীল দেশে খুব শীঘ্র এই যন্ত্রের ব্যবহার সকলের জন্য সম্ভব হবে না। কয়েকজন চিকিৎসক ব্যক্তিগত ভাবে নিজেরা এই যন্ত্র এনে ব্যবহার করছেন এবং আপাততঃ শুধু ধনীরা এই পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয়ের সুযোগ নিতে পারবেন। বড় শহরে, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই যন্ত্রের ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকবে।

হেনরি ক্যাভেনডিস : বাতাস ও জল

বাতাস না থাকলে মানুষ বাঁচে না, এ কথা কারও অজানা নয়। আর শুধু মানুষ কেন সমস্ত প্রাণীজগৎ, গাছ-পালা বাতাস না থাকলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বাতাসের উপাদান কি, আজ সকলেই তা জানে।

ঠিক একই রকমে জল ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। জল না থাকলে পৃথিবী থেকে জীবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পৃথিবী হবে মরুভূমি। জলের উপাদান কি তাও আমরা জানতে পেরেছি।

কিন্তু যে বিজ্ঞানীরা আমাদের জল ও বাতাসের কি উপাদান তা জানিয়েছেন, তাঁদের পরিচয় অনেকের কাছে অজানা। কেমন করে তাঁরা জল ও বাতাস বিশ্লেষণ করেছেন, সেই তথ্য বিজ্ঞানী সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছেন সে ঘটনাও অনেকের কাছে অজানা।

এই সব আবিষ্কার কিন্তু একজনের প্রচেষ্টায় হয়নি। যে সব বিজ্ঞানীর কঠোর পরিশ্রমের ফলে এই সব তথ্য জানা গিয়েছে তার মধ্যে তিনজনের অবদান স্মরণীয়।

এই তিনজনের মধ্যে হেনরি ক্যাভেনডিস বয়সে সবচেয়ে বড় তাঁর আবিষ্কারের কাহিনীই আগে বলছি।

ইংলণ্ডের এক লর্ড পরিবারের ছেলে হেনরি ক্যাভেনডিস। বাবা লর্ড চার্লস, মা লেডি অ্যান। হেনরি জন্মেছিলেন ফ্রান্সে ১৭৩১ অকটোবর মাসে। পিতা চার্লস বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহী ছিলেন এবং তখনকার দিনে থার্মোমিটার নিয়ে গবেষণা করে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি থেকে 'কোপলে' পদক পেয়েছিলেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে হেনরি ও তাঁর ছোট ভাই প্রচুর সম্পত্তি



ক্যাভেনডিস

পেয়েছিলেন। হেনরি সেই অর্থ কি ভাবে লগ্নী করা হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না ; তাঁর কর্মচারী ও ব্যাঙ্কার যা ভাল বুঝবেন তাঁদের ওপর তাই করার নির্দেশ ছিল। মোদ্দা কথা, তাঁর হুকুম ছিল এই সব ছোটখাট ব্যাপারে তাঁকে যেন বিরক্ত করা না হয়। লর্ড পরিবারের ছেলে হলেও বেশভূষার দিকে তাঁর নজর ছিল না। তাঁর পোশাক ছিল ছেঁড়া ও তালি দেওয়া, আর এতো পুরানো যা দেখে অপরিচিতরা তাঁকে ভিখারী ছাড়া কিছু ভাবতে পারতেন না। কিন্তু তিনি মৃত্যুকালে ১০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। এই সব কারণে তাঁকে 'ছিটগ্রস্ত' বলা হতো। হয়তো তাই। তবে তিনি যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এ বিষয়ে আজ আর কোনো দ্বিমত নেই।

মাকে হারিয়েছিলেন তিনি তাঁর ছোটভাইয়ের জন্মের সময়ে। লেখাপড়া আরম্ভ হয়েছিল 'লর্ড পরিবারের প্রচলিত প্রথা অনুসারে। এগারো বছর বয়সে হ্যাকনি'তে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানো হলো। সেখানকার পাঠ সাঙ্গ করে আঠারো বছর বয়সে ভর্তি হলেন কেমব্রিজে। চার বছর

পড়লেন সেখানে। ধর্ম বিষয়ে পড়তে তিনি রাজী ছিলেন না। অথচ ধর্ম বিষয়ে পরীক্ষা না দিলে পরীক্ষায় পাশ করতে পারবেন না। সেইজন্য বিরক্ত হয়ে পরীক্ষা না দিয়ে চলে এলেন। শেষে তিনি ও ছোটভাই ফ্রেডারিক প্যারী গেলেন, পদার্থবিদ্যা ও অঙ্ক বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য।

বাবা লর্ড চার্লস ছেলেদের কাছে তাঁর আর্থিক সঙ্গতির কথা গোপন রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য-ছেলেদের মাথা যাতে বিগড়ে না যায়। পড়ার সময় যৎকিঞ্চিৎ হাত খরচা দিতেন। পরে, হেনরি'র বয়স যখন চল্লিশ তখন ওঁর বাবা মারা গেলেন। বাবার মৃত্যুর পরে হেনরি জানতে পারলেন কত সম্পত্তি তিনি রেখে গেছেন।

হেনরি একা থাকতে পছন্দ করতেন। বন্ধু-বান্ধব কেউ ছিল না, আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করা তিনি পছন্দ করতেন না। কারো সঙ্গে বসে যে একটু গল্প করবেন এ প্রকৃতি তাঁর ছিল না। তিনি কখনও অপ্রয়োজনে কথা খরচ করতেন না। শিশু বয়সে মা'কে হারিয়ে তাঁর মেয়েদের সম্পর্কে একটা বিরূপ ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। বাড়ীতে যে মেয়েটি সংসারের কাজ করতো, তিনি তাকেও এড়িয়ে চলতেন। তাঁর আদেশ ছিল কোন দরকার হলে যেন লিখে তাঁকে জানান হয়। তিনিও টেবিলে নির্দেশ লিখে রাখতেন।

একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, যেটি হলো লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি। মাত্র ২৯ বছর বয়সে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো' হয়েছিলেন। মাঝে মধ্যে সহযোগী সদস্যদের সঙ্গে ক্লাবে খেতে যেতেন।

সে সময়ে বিজ্ঞানীদের সামনে ছিল প্রশ্নের পাহাড়। অনেক 'কি ও কেন' জমা হতো, যার উত্তর কারো জানা ছিল না। তেমনি এক প্রশ্ন ছিল আগুন নিয়ে। আগুন কি? দু'জন জার্মান বিজ্ঞানীর মতে দহনের পরে পদার্থের যা পড়ে থাকে তা হলো ছাই। আর দাহ্য পদার্থের মধ্যে আছে 'ফ্লোজিষ্টন' (Phlogiston)। যখন কোনো

পদার্থে আগুন দেওয়া হয় 'ফ্লোজিষ্টন' ছাড়া পায়। ফ্লোজিষ্টন নিঃশেষ হলে আগুন নিভে যায়।

সকলে এই তথ্য মেনে নিয়েছিলেন; যদিও কেউ ফ্লোজিষ্টন' দেখেননি। তাকে আলাদা করার কেনো চেষ্টাও করা হয়নি।

হেনরি ঠিক করলেন, তিনি চেষ্টা করে দেখবেন 'ফ্লোজিষ্টন' আলাদা করা যায় কিনা।

লাইব্রেরিতে বই ঘাঁটতে লাগলেন হেনরি। খুঁজে দেখলেন আগুন সম্বন্ধে কে কি লিখেছেন। দেখতে পেলেন প্যারাসেলসাস ও হেলমর্ট নামে দুই বিজ্ঞানী এক প্রকার বাতাসের কথা লিখেছেন যাতে আগুন লাগানো যায়। তাঁরা দেখেছিলেন সালফিউরিক এসিডের মধ্যে লোহার টুকরো ফেলে দিলে বুদ্‌বুদ্ সৃষ্টি হয়ে উপর দিকে আসে। এই বুদ্‌বুদ কাঁচের পাত্রে সংগ্রহ করে আগুন দিলে সুন্দর ভাবে জ্বলতে থাকে। হেনরি মনে করলেন, এই বুদ্‌বুদ্ বা বাতাসই বোধহয় ফ্লোজিষ্টন'—যা তিনি খুঁজছেন।

হেনরি ঠিক করলেন, তিনি এই বিষয়ে গবেষণা করবেন। তিনটি পাত্রে সালফিউরিক এসিড, অন্য তিনটি পাত্রে হাইড্রোক্লোরিক এসিড রেখে তিনি লোহা, দস্তা ও টিনের ছোট টুকরো আলদা করে ছ'টি এসিডের পাত্রে ফেলে দিলেন। ধাতুর ওপর এসিডের বুদ্‌বুদ্ সৃষ্টি হলো। হেনরি বিভিন্ন ধাতুর সঙ্গে ভিন্ন প্রকৃতির এসিড মিশ্রণে যে বুদ্‌বুদ্ সৃষ্টি হলো তা পৃথকভাবে ছ'টি পাত্রে ভরে নিলেন। পাত্রগুলি ছিল প্রাণীর মূত্রাশয়, যা তিনি নিয়ে এসেছিলেন কসাইখানা থেকে।

হেনরি তারপরে মূত্রাশয়ের বাতাস ওজন করলেন। প্রত্যেকটির ওজন সমান, আর খুব হালকা।

এরপরে তিনি মূত্রাশয়ের বাতাস বার করার জন্য কাঁচের তৈরি সরু নল লাগিয়ে একে একে আগুন দিলেন। ঐ বাতাস জ্বলে কিনা দেখা যাক। আশ্চর্য ব্যাপার! প্রত্যেকটি নলের মুখে হালকা নীলাভ আগুনের শিখা।

তিনি আরও পরীক্ষা করে দেখলেন কতটা বাতাস পাওয়া যাবে তা নির্ভর করবে ধাতুর পরিমাণের ওপর। যদি বেশি পরিমাণ ধাতু এসিডে দেওয়া হয়, বেশি বাতাস পাওয়া যাবে। তাঁর ধারণা হলো, এই 'বাতাস' এসিড থেকে সৃষ্টি হয়নি, হয়েছে ধাতু থেকে। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ছিল ভ্রান্ত। এই পরীক্ষাকে ভিত্তি করে তিনি মনে করলেন যে তিনি 'ফ্লোজিষ্টন' আলাদা করে ফেলেছেন এবং তার ওপর ভিত্তি করে তিনি ১৭৬৬ সালে রয়েল সোসাইটির সভ্যদের সামনে তাঁর মত প্রকাশ করলেন।

সে যুগের বিজ্ঞানীরাও 'ফ্লোজিষ্টন' তত্ত্ব মেনে নিলেন। তাঁরা প্রশ্ন করলেন না যে কোনো ধাতু পোড়ানো হলে যদি তার থেকে 'ফ্লোজিষ্টন' বেরিয়ে যায়, তাহলে তো দহনের পরে তার ওজন কমে যাবে। কিন্তু যা দেখা যায় তা হলো দহনের পরে যে ছাই পড়ে থাকে, তার ওজন বেশি।

এই ভুল ধারণা শুধু হেনরি ক্যাভেনডিস নয়, সে যুগে সব বৈজ্ঞানিকের ছিল, যতদিন না ল্যাভয়েসিয়ের প্রমাণ করলেন এই ধারণা ভ্রান্ত। আসলে হেনরি যে বতোস পৃথক করেছিলেন তা হলো 'হাইড্রোজেন'*।

এরপর গবেষণাগারে হাইড্রোজেন নিয়ে নানা বিজ্ঞানী নানাভাবে পরীক্ষা করা আরম্ভ করলেন। বদ্ধ কাঁচের জারে হাইড্রোজেন ভরে বিদ্যুৎ তরঙ্গ চালনা করে দেখা গেল পাত্রের মধ্যে জলকণা সৃষ্টি হয়েছে।

এইসব পরীক্ষার কথা যখন হেনরি'র কানে গেল তিনি অন্য কাজ ফেলে রেখে আবার ল্যাবরেটারিতে কাঁচের জারের মধ্যে বাতাস ও হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন ভরে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ চালনা করলেন।* দশ বছর ধরে নানাভাবে পরীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহ করে

* হাইড্রোজেন সর্বপ্রথম তৈরি করেছিলেন রবার্ট রয়েল ১৬৭২ সালে।

* ইতিমধ্যে ১৭৪৪ সালে প্রিসলে এবং শীলে নামে আর দুজন বিজ্ঞানী অক্সিজেন পৃথক করেছেন।

১৬৮৪ সালে 'বাতাসের উপর পরীক্ষা' নামে গবেষণা পত্র রয়েল সোসাইটিতে জমা দিলেন। তিনি জানালেন যখন 'ফ্লোজিষ্টন' (হাইড্রোজেন) ফ্লোজিষ্টন মুক্ত বাতাসের (অক্সিজেন) সঙ্গে মেশে তখন জল সৃষ্টি হয়। তিনি আরও প্রমাণ করলেন যে যখন ২ ভল্যুম (Volume) হাইড্রোজেন ১ ভল্যুম (Volume) অক্সিজেনের সঙ্গে মেশে, তখন জলকণা সৃষ্টি হয়, সেই জলের ওজন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ওজনের সমান। এইভাবে ১৭৮১ সালে তিনি প্রমাণ করলেন জল আসলে দু'টি বর্ণহীন গ্যাসের মিশ্রণে সৃষ্টি হয়।

গবেষণা পত্রে হেনরি আরও প্রমাণ করলেন, যে বাতাস আমরা গ্রহণ করি তার মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ মাত্র ২০ ভাগ। তিনি আরও প্রমাণ করলেন যে বজ্রপাতের সময় বিদ্যুৎ সঞ্চার হলে অক্সিজেন মেশে নাইট্রোজেনের সঙ্গে। এর ফলে প্রাকৃতিক উপায়ে সার সৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টির ধারার সঙ্গে মাটিতে নেমে এসে জমি উর্বর করে। তিনি বাতাস ভর্তি পাত্রে বারবার বিদ্যুৎ সঞ্চার করে নাইট্রোজেন-এর সঙ্গে অক্সিজেন এমনভাবে মেশালেন যে সমস্ত বাতাসটাই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু না-তখনও বদ্ধ কাঁচপাত্রে এক ফোঁটা বাতাস দেখা যাচ্ছে। সেটা কি হতে পারে? সেটি এক প্রকার বিরল গ্যাস, নাম 'আরগন্' (Argon), যা বাতাসে শতকরা মাত্র ১ ভাগ পাওয়া যায়।

হেনরি ক্যাভেনডিস মারা গেছেন ৭৯ বছর বয়সে ১৮১০ সালে। চিরকাল একাই দিন কাটিয়েছিলেন, দেখাশোনা করার কেউ ছিল না। তাঁর সমাধিতে (ডার্বির এক গির্জাতে) স্মারক হিসেবে একটি পাথরের ফলকে তাঁর জীবন কাহিনী আজও লেখা আছে। যদিও জীবিত অবস্থায় তাঁকে ধর্মে অবিশ্বাসী বলে মনে করা হতো, আসলে কিন্তু অধার্মিক তিনি ছিলেন না।

তাঁর উত্তরাধিকারীরা তাঁর ফেলে যাওয়া বিশাল সম্পত্তির আয় থেকে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন, যার নাম ক্যাভেনডিস ল্যাবরেটারি। এখানেই টমসন ১৮৯৭ সালে ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে এই গবেষণাগৃহের ৬ জন গবেষক পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

জোসেফ প্রিসলে ঃ কার্বন-ডাই-অক্সাইড অক্সিজেন

ইংল্যাণ্ডের লীডস্ শহরে এক পাদরী সাহেব যে বাড়ীতে থাকতেন তার পাশেই ছিল এক বিরাট মদের কারখানা। মদ তৈরী করার সময়ে কারখানার আশেপাশে এক অদ্ভুত গন্ধ ছড়াত। সাহেবটি পাদরী হলেও তার মনের মধ্যে এক বিজ্ঞানী লুকিয়ে ছিল। দিনের পর দিন ঐ গন্ধ পাচ্ছেন তিনি, জানতে ইচ্ছে হয়, কি সে জিনিস যে এই গন্ধ ছড়াচ্ছে ; কি ভাবে সৃষ্টি হচ্ছে এই গ্যাস ?

শেষে মনের সব দ্বিধা সরিয়ে ফেলে কারখানার মালিককে গিয়ে পাদরী সাহেব বললেন, 'তোমাদের ভাটি থেকে যে গ্যাস বেরোয়, আমাকে সেই গ্যাস জার-এর মধ্যে ভরে নিতে দেবে ?'

এতে মালিকের আপত্তি করার কি থাকতে পারে ? তিনি অনুমতি দিলেন।

খুশী মনে পাদরী সাহেব সেই গ্যাস নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। নানা-ভাবে পরীক্ষা করতে হবে। এই গ্যাসে আগুন জ্বলে কিনা ?

না, আগুন জ্বলল না। উপরন্তু জারের মধ্যে জ্বলন্ত কাঠ ফেলে দিলে কাঠের আগুন নিভে যায়।

পাদরী সাহেব ভাটিখানা থেকে জেনে নিলেন কি ভাবে এই গ্যাস তৈরী হয়। তারপরে বসলেন নানা বই নিয়ে। না, এই গ্যাস নিয়ে এখনও পর্যন্ত কেউ মাথা ঘামায় নি। তিনি ঐ গ্যাস জলে মেশাবার উপায় আবিষ্কার করলেন। এই আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁকে একটি স্বর্ণপদক উপহার দেওয়া হয়।

এখন আমরা জানি সেই পাদরী যে গ্যাস আবিষ্কার করেছিলেন তার নাম কার্বন ডাই অক্সাইড, যা আমরা সোডা-লেমনেড ইত্যাদি



প্রিসলে

পানীয় জলে নিত্য ব্যবহার করি। পৃথিবীতে হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যবসা চলছে এই পানীয় প্রস্তুত করতে।

এই পাদরী সাহেব কে ?

তাঁর নাম জোসেফ প্রিস্‌লে। লীডসের কাছেই এক ছোট শহরে তাঁর জন্ম ১৭৩৩ সালে ১৩ই মার্চ। বাবা ছিলেন গরীব তাঁতি। জোসেফে'র বয়েস যখন মাত্র ৭ বছর তখন তার বাবা মারা গেলেন। অনাথ জোসেফ'কে নিয়ে গেলেন তার এক পিসিমা। তিনি ছিলেন এক ধর্ম প্রাণা মহিলা। ভাইপোকে পাদরী করার জন্য পাদরীদের স্কুলে ভর্তি করলেন। মেধাবী বালক অল্প দিনেই বহু ভাষা শিখে নিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করলেন। মাতৃ ভাষা ইংরেজী ছাড়া ফরাসী, ইতালী, জার্মান ও আরবী ভাষা অল্প সময়ে শিখে নিলেন। তবে তাঁর কথা বলতে একটু খুঁত থাকার জন্য তিনি ভাল কাজ পেলেন না। এক ছোট গির্জাতে সপ্তাহে ১ পাউণ্ড পারিশ্রমিকে কাজ পেলেন। কিন্তু তাতে তো অভাব মেটে না। অগত্যা তিনি এক স্কুলে শিক্ষকের চাকরী নিলেন। সারাদিন শিক্ষকতা করে পরে আবার বাড়ীতে ছাত্র পড়াতে হোত। এত কাজের মধ্যেও সময় করে তিনি একটি গ্রামার বই লিখে

ফেললেন। শেষে তিনি পাদরীদের ভাষা শিক্ষকের চাকরী পেলেন। ভাষা নিয়ে লেখাপড়া করলেও, রসায়ন বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভে দারুণ আগ্রহ ছিল। স্কুলে শিক্ষক যখন রসায়ন শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন, তিনি ক্লাসের পিছনে বসে বক্তৃতা শুনতেন। রসায়ন এত ভাল লাগল যে তিনি বাড়ীতে ফিরে নিজেই রসায়ন নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা করতে লাগলেন। কোন কিছু বুঝতে অসুবিধে হলে ছুটে যেতেন বিজ্ঞানীদের কাছে। এর ফলে স্থানীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর বেশ আলাপ পরিচয় হয়ে গেল।

এই সময়ে বিদেশের এক বিজ্ঞানীর সঙ্গে প্রিসলে'র বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। তিনি হলেন আমেরিকার বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। তখন আমেরিকা স্বাধীনতার জন্য বৃটেনের সঙ্গে যুদ্ধে রত। সে দেশের দূত হিসেবে বেঞ্জামিন ইংল্যাণ্ডে এসেছেন আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য জনমত সৃষ্টি করতে। কিন্তু সে কথা বললে তো তিনি ইংল্যাণ্ডে প্রবেশের ছাড়পত্র পাবেন না; সেইজন্য তাঁকে আসতে হয়েছিল বিজ্ঞানীর ছদ্মবেশে। অবশ্য সত্যই তিনি সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ছিলেন।

তাঁর আসার খবর পেয়ে প্রিসলে ছুটলেন লণ্ডনে। দু'জনে বন্ধুত্ব হোল। তাঁর কাছ থেকে, প্রেরণা পেয়ে প্রিসলে 'বিদ্যুতের ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি' নামে একটা বই লিখে ফেললেন। তাঁর বইখানি বিজ্ঞানী সমাজে খুব সাড়া তুলেছিল। আর ইংল্যাণ্ডের 'রয়েল সোসাইটি' ১৭৬৬ সালে তাঁকে সোসাইটির সদস্য মনোনীত করে।

তাঁর গবেষণার বিষয় দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে ফ্রান্সেও পৌঁছেছিল। তাঁরা জোসেফ প্রিসলেকে সে দেশের বিজ্ঞানী সভার সদস্য নির্বাচিত করে।

ফ্রাঙ্কলিনের সঙ্গে আলাপ করে প্রিসলে বুঝলেন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রাম ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছিলেন স্পষ্ট বক্তা। সেই কারণে মুক্তি যুদ্ধে আমেরিকার পক্ষে অভিমত প্রকাশে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। এর ফলে নিজের দেশে এক দল লোককে তিনি শত্রু

সৃষ্টি করলেন। তবে ফ্রাঙ্কলিনের সঙ্গে তাঁর আজীবন বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো।

তাঁর কাজে শেষে গীর্জা কর্তৃপক্ষও বিরক্ত হলেন। একজন পাদরীর প্রধান কাজ নিজেরগ্রামে ধর্মপ্রচার ও ধর্মশিক্ষা দেওয়া; আর তিনি কিনা সব সময়ে ল্যাবরেটারী, ফ্লাস্ক, বিকার আর টেষ্ট টিউবের মধ্যে বসে আছেন। অন্য সময়ে মদের ভাটিখানার মধ্যে। ছিঃ, ছিঃ, লোকে বলবে কি? এ রকম পাদরীর কাছে কে ধর্ম উপদেশ ব্যনরে? গীর্জা কর্তৃপক্ষ কাজ ছেড়ে দিতে বললেন।

চাকরী চলে যাওয়ায় জোসেফ প্রিসলে'র ভালই হয়েছিল। লর্ড শেলবার্ণ নামে এক ভদ্রলোক প্রিসলেকে তাঁর পরিবারের লাইব্রেরীর দায়িত্ব দিলেন। শেলবার্ণ নিজে ছিলেন পণ্ডিত, প্রিসলের কাজের গুরুত্ব বুঝতে তাঁর দেরী হয়নি। প্রিসলির গবেষণার জন্য একটা ল্যাবরেটারীও করে দিলেন লর্ড শেলবার্ণ। শীতের সময় লণ্ডন আর গরমে দেশের বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা হোল। এ ছাড়া বছরে ২৫০ পাউণ্ড মাইনের ব্যবস্থাও করে দিলেন।

লর্ড শেলবার্ণের পরিবারে থাকার সময়ে জোসেফ প্রিসলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করে সেগুলি বিভিন্ন বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করেন। পরে শেলবার্ণের সঙ্গে তাঁর প্যারী যাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল। সেখানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হোল সমসাময়িক বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভেয়-সিয়েরের সঙ্গে। তিনি প্রিসলের গবেষণা বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখতেন। তিনি প্রিসলিকে জানালেন তাঁর নতুন আবিষ্কার করা বাতাস যাকে 'ডি-ফ্লোজিসস্টিনেটেড' বললেন সেটি আসলে হোল অক্সিজেন।

ধীরে ধীরে জোসেফ প্রিসলের খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। ১৭৮০ সালে ইল্যাণ্ডের 'লুনার সোসাইটি' তাঁকে আমন্ত্রণ করে সভ্য করে নিলেন। এই সমিতি প্রতিমাসে পূর্ণিমার কাছাকাছি যে সোমবার পড়ত, সেই সন্ধ্যায় সভা করতেন। সেকালের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী-শিল্পপতিরা এই সমিতির সদস্য ছিলেন। জেমস ওয়াট (যিনি

বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরী করে ছিলেন), জোসিয়া ওয়েজউড (সে যুগের বিখ্যাত পটারী শিল্পপতি), ইরাসমাস ডারউইন (বিশ্ববিখ্যাত চার্লস ডারউইনের বিজ্ঞানী পিতামহ), এর মত খ্যাতি সম্পন্ন লোকেরা ছিলেন এই সোসাইটির সদস্য। তাঁরা প্রিসলেকে উৎসাহিত করে বললেন, 'গবেষণা করে যান, যা টাকা লাগবে, সোসাইটি দেবে।'

তবে প্রিসলে ছিলেন এক আদর্শবাদী নির্লোভী বিজ্ঞানী। গবেষণা কাজে যদি টাকার অভাব পড়ত, তখনই তিনি টাকা নিতেন। তাছাড়া তিনি অন্য কোন সাহায্য নিতেন না। গবেষণালব্ধ ফল অপরকে বিক্রি করে বড়লোক হওয়ার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না।

গবেষণা তাঁর প্রধান কাজ হলেও মাঝে মাঝে তিনি স্পষ্ট কথা বলে ফেলতেন। কোন কোন সময় তাঁর রাজনৈতিক মন্তব্যের জন্য অন্যের বিরাগ ভাজন হয়েছেন। সেই কারণে প্রিসলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিজের দেশে বেশীদিন গবেষণার সুযোগ পাননি। যখন ফরাসী বিপ্লব চলছে, প্রিসলি নিজেকে সেই আন্দোলনে জড়িয়ে ফেললেন। লিখলেন, 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা' নিয়ে নিবন্ধ। অভিমত প্রকাশ করলেন, 'শাসন-যন্ত্রের ওপর গীর্জা'র প্রভাব থাকা ঠিক নয়।' এর ফলে ইংল্যাণ্ডের এক শ্রেণীর মানুষ তাঁর শত্রু হলেন। প্রিসলের ওপর চটে গিয়ে, তাঁকে আক্রমণ করে বহু বক্তা বিভিন্ন সভায় তাদের বক্তব্য রাখেন। এর মধ্যে ইংল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তা এডমণ্ড বার্ক'ও ছিলেন।

এডমণ্ড বার্কের নাম আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের কাছে অজানা নয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক হিসেবে ওয়ারেন হেস্টিংস এদেশে খাবার লুকিয়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি, জালিয়াতি করে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি দেওয়া ইত্যাদি যে সব অপকীর্তি করেছিলেন তার জন্য এডমণ্ড বার্ক ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নিন্দাপ্রস্তাব এনে এক স্মরণীয় ভাষণ দিয়েছিলেন।

এডমণ্ডবার্ক যে বক্তব্য ফরাসী বিপ্লবের বিষয়ে বলেছিলেন তাতে

অন্যায় কিছু ছিলনা। তার বক্তব্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই ন্যায়ভিত্তিক। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন উপনিবেশের লোকদের সঙ্গে লড়াই না করে তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে একটা মিটমাট করে নিতে।

ফরাসী বিপ্লব ন্যায় কি অন্যায় সে বিতর্কে তিনি যান নি। তিনি বিপ্লবীদের হিংসাত্মক আচরণ ও তাদের সমর্থন করার জন্য বিপ্লবী ও প্রিসলেকে নিন্দা করে এক বক্তৃতা করেন। তিনি অন্যায় কথা বলেন নি।

কিন্তু ফল হোল গুরুতর। ইংল্যাণ্ডের মানুষ বার্কের কথায় যেন ক্ষেপে গেল। কিন্তু হাতের কাছে তো ফরাসীরা নেই, প্রিসলে আছেন। আর প্রিসলে বিপ্লবীদের সমর্থন করছেন। সুতরাং···

সুতরাং প্রিসলের বাড়ী ও ল্যাবরেটারীতে দলবদ্ধভাবে হামলা হোল। জনতা তার বাড়ীর আসবাব পত্র ভেঙ্গে ফেলল। বইপত্র ছিঁড়ে তছনছ করল। ল্যাবরেটারীর যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে ফেলে শেষে বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিল। প্রিসলের ২০ বছরের গবেষণা ও পরিশ্রমের লিপিবদ্ধ ফল—কয়েক মাইল জুড়ে পথে পথে উড়তে থাকল!

ভাগ্যক্রমে সেদিন প্রিসলে সপরিবারে বার্মিংহাম হয়ে লণ্ডনে পালাতে পেরেছিলেন। এদিকে ফ্রান্সে সাধারণ নিরপরাধ মানুষের ওপর বিপ্লবীদের হিংস্র অত্যাচার বাড়তে থাকল। ফলে প্রিসলের ওপর সাধারণ মানুষের রাগ বাড়তে থাকল।

শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে দেশদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হোল। ফলে রয়েল সোসাইটির বন্ধুরাও তাঁকে বর্জন করলেন। দুঃখে অভিমানে ১৭১৪ সালে প্রিসলে ইংল্যাণ্ড ছেড়ে আমেরিকা চললেন।

নিউইয়র্কে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দারুণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। এখানে ছেলেদের সঙ্গে তাঁর মিলন হল। তারা গোলমালের আরম্ভেই আমেরিকায় চলে এসেছিল।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রিসলের সমর্থনের কথা আমেরিকা ভোলেনি। প্রিসলেকে নানা কাজের প্রস্তাব দেওয়া হোল। চার্চের অধ্যক্ষ, পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, না ভ্রাম্যমান অধ্যাপক পদ। কি চান তিনি ?

অবশ্য এ সবই হয়েছিল বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের পরামর্শ মত। তাঁরই সাহায্যে প্রিসলের সঙ্গে জেফারসনের সাক্ষাৎকার ঘটেছিল এবং জর্জ ওয়াশিংটনের সঙ্গে প্রিসলে চা-চক্রে মিলিত হয়েছিলেন।

কিন্তু প্রিসলে সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখান করে নর্দাম্বারল্যাণ্ডে এক এক নির্জন জায়গায় নিজের ল্যাবরেটারী গড়ে নিলেন। আজ সেই ল্যাবরেটারী জাতীয় সৌধ হিসেবে রক্ষিত। সেই সৌধ এখনও অগণিত দর্শক আকর্ষণ করছে ; তাঁর আবিষ্কার করা যন্ত্র দেখতে এ যুগের দর্শকরা কম আগ্রহী নয়।

প্রিসলে কি এমন আবিষ্কার করে ছিলেন। যার জন্য আমেরিকা তাঁকে অত সম্মানজনক চাকরীর প্রস্তাব দিয়েছিল। তিনি অক্সিজেন আবিষ্কার করেছিলেন, যা ছাড়া প্রাণীজগৎ বাঁচতে পারে না।

যে উপায়ে তিনি অক্সিজেন আবিষ্কার করেছিলেন সেটা আজ আমাদের মনে হবে খুব সহজ। তিনি এক কাঁচের ফ্লাস্কের মধ্যে কিছু পারদ অক্সাইড এবং এই ফ্লাস্কে আংশিক ভাবে পারদ ভরলেন। তারপরে একটি পারদ ভরা পাত্রে ফ্লাস্কটিকে উপুড় করে রাখলেন। পরে ম্যাগনিফাইং কাঁচের সাহায্যে সূর্যরশ্মি দিয়ে পারদ অক্সাইড গরম করলেন। এই ক্রিয়ার ফলে যদি কোন গ্যাস সৃষ্টি হয় পারদের মাত্রা নিচে নেমে যাবে। অপর দিকে এর ফলে যদি গ্যাস ব্যবহার হয় পারদ উপর দিকে উঠে যাবে।

প্রিসলে লক্ষ্য করলেন পারদ অক্সাইড গরম করার পরে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস মুক্ত হয়েছে ; যার ফলে পারদের মাত্রা নেমে গেছে তলার দিকে। তিনি আরও দেখলেন ঐ পাত্রের মধ্যে বাতি আরও উজ্জ্বল ভাবে জ্বলছে। ইঁদুর ছানা ঐ পাত্রের মধ্যে বেঁচে থাকছে।

এর পরে তিনি এক বড় আবিষ্কার করেন গাছের শ্বাসক্রিয়া সম্বন্ধে। একটি কাঁচ পাত্রের মধ্যে ছোট গাছ রেখে, পাত্রের মধ্য থেকে সমস্ত হাওয়া বার করে নিলেন। তার পরে ঐ পাত্রের মধ্যে মোমবাতি জ্বেলে রাখলেন। মোমবাতি নিভে গেল, কারণ বাতাস নেই, অক্সিজেন নেই। কিন্তু দশদিন পরে জ্বলন্ত মোমবাতি পাত্রের মধ্যে রাখার পরে জ্বলতে থাকল। অক্সিজেন এলো কি ভাবে? গাছ থেকে পাত্রের মধ্যে অক্সিজেন সৃষ্টি হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা গেল কি প্রকৃতি অক্সিজেন সৃষ্টি করে। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় গাছের কি ভূমিকা বুঝতে পারল।

আমেরিকায় গিয়ে প্রিসলে আবিষ্কার করলেন আর একপ্রকার গ্যাস—কার্বন-মনোক্সাইড। কয়লা, পেট্রল যদি পোড়বার সময় কম পরিমাণ অক্সিজেন পায়, তখনই এই গ্যাস সৃষ্টি হয়। এই গ্যাস ভীষণ বিষাক্ত। শীতের সময় ঘর গরম রাখতে অনেক সময় ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করে জ্বলন্ত উনুন রাখলে এই গ্যাস সৃষ্টি হয়। এর ফলে প্রতি বছর কিছু মানুষের মৃত্যু হয়। বন্ধ গ্যারেজে গাড়ীর কাঁচ তুলে দিয়ে ইঞ্জিন চালু রাখলে গাড়ীর আরোহীর মৃত্যু ঘটতে পারে।

প্রিসলে প্রথম দিকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মধ্যপর্বে অক্সিজেন, আর শেষ পর্বে কার্বন মনোক্সাইড আবিষ্কার করে অমরত্ব লাভ করেন। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের বিরোধিতা এসেছে নানা মহল থেকে। কিন্তু বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

জোসেফ প্রিসলে শেষ পর্যন্ত আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করেন এবং বাকী জীবনটা সে দেশেই কাটিয়েছিলেন। ১৮৫৪ সালে আমেরিকাতেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

এন্তনি লরেণ্ট ল্যাভয়সিয়ের

কোন অত্যাচারী শাসক, যার কোন অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে কেউ সাহস করেনি তার জীবিত অবস্থায়, কিন্তু মৃত্যুর পরে তার কঙ্কালকে ফাঁসিতে ঝোলান হয়েছে, এমন ঘটনা ইতিহাসে আছে। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পরে তাকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল।

বিপরীত ঘটনার নজিরও আছে; কোন নির্দোষীকে বিচারের প্রহসনের পরে হত্যা করে, পরে তাকে সমাধি থেকে তুলে রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় সমাধিস্থ করা হয়েছে। এটিও ইতিহাস।

১৭৯৪ সালে ফরাসী বিপ্লবের সময় ল্যাভয়সিয়ের'কে গিলোটিনে হত্যা করার দু'বছর পরে আবার তাঁকে বিশেষ সমাধি ক্ষেত্রে মর্যাদার সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়।

ফরাসী বিপ্লবে কিছু অসৎ ও অত্যাচারী শাস্তি পেয়েছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে বহু নির্দোষ, ও সৎ পণ্ডিতকে হত্যা করা হয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল ব্যক্তিগত স্বার্থে, কোথাও বা গণরোষের প্রতিক্রিয়ায়। যার জন্য ঐ হতভাগ্যরা মোটেই দায়ী ছিল না।

এডমণ্ড বার্ক এই নির্বিচার ও পাশবিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করেছিলেন। অভ্যুত্থানের নায়করা প্রথমে স্বীকার না করলেও পরে ল্যাভয়সিয়ের'কে মর্য্যাদা সহকারে পুনঃসমাধিস্থ করে অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে তাদের দোষ স্বীকার করেছিলেন।

ল্যাভয়সিয়ের এর জন্ম প্যারী'তে, ২৬শে আগষ্ট ১৭৪৩ সালে। বাবার প্রচুর জমি-জমা ছিল, তার ওপর ছিল বড় ব্যবসা। খুব ছোট বয়সে ল্যাভয়সিয়ের' এর মা মারা গিয়েছিলেন। অবিবাহিত এক



ল্যাভয়সিয়ের

পিসিমা তাঁকে মানুষ করেন। বাবাও সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন তাঁর ওপরে এবং মাতৃহীন পুত্রকে কোনদিন মায়ের অভাব বুঝতে দেন নি।

ল্যাভয়সিয়ের বিজ্ঞানে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু বাবা চেয়েছিলেন ছেলে আইনবিদ হোক; বাবার ইচ্ছাপূরণের জন্য তিনি আইন পড়ে প্রাকটিস আরম্ভ করলেন।

আইন কলেজে পড়ার সময়ে তিনি এক বিজ্ঞান অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনতে যেতেন; অপর এক অধ্যাপকের ল্যাবরেটারীতে গিয়ে দেখতেন রসায়নের পরীক্ষা ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ।

আইনজীবি হয়েও তিনি প্যারিসের পথ-উদ্যান আলো দিয়ে সাজানোর এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। সেজন্য ফরাসী বিজ্ঞান একাডেমী তাঁকে স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করে।

এর পরে তিনি ফরাসী দেশের ভূতাত্ত্বিক প্রকৃতি নিয়ে এক সমীক্ষা করেন। খনি থেকে জিপসাম ও তাকে জলবিহীন (Anhydrous) করে প্লাসটার অব প্যারী (Plaster of Paris) তৈরী করার

পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করেন। এই সব কাজের জন্য মাত্র ২৪ বছর বয়সে তাঁকে ফরাসী বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য করা হয়।

যখন তাঁর বয়স ২৮ বছর, তার সঙ্গে পরিচয় হোল তাঁর প্রায় আধাবয়সী মেরী অ্যান পল্যায়'এর সঙ্গে। দু'জনে ভালবাসা হোল, বিয়েও হয়ে গেল।

মেরী ছিলেন খুবই বুদ্ধিমতী, তাঁদের বিবাহ বেশ সুখের হয়েছিল। তিনি তাঁর স্বামীর সব কাজে সাহায্য করতেন ; সচিব হিসেবে কাগজ পত্র ঠিক রাখা, চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়ার কাজও করতেন। ল্যাভয়সিয়ের'এর বিদেশী ভাষা জানা ছিল না। মেরী মাতৃভাষা ছাড়া ইংরেজীও জানতেন। তিনি ক্যাভেনডিস ও প্রিসলের ইংরেজী প্রবন্ধের ফরাসী অনুবাদ করে তাঁকে পড়তে দিতেন। ল্যাভয়সিয়ের'এর বই বা প্রবন্ধের ছবি ও রেখা চিত্রগুলি ছিল মেরী'র আঁকা। মোটকথা মেরী ল্যাভয়সিয়ের'এর যোগ্য সহকারী ছিলেন। ল্যাভয়সিয়ের'এর বাড়ীতে দেশ-বিদেশের জ্ঞানী-গুণী লোকেরা প্রায়ই আসতেন, বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করতেন। বুদ্ধিমতী মেরী আলোচনার বিষয়-বস্তুর সারাংশ লিখে রাখতেন।

সে সময়ের বিজ্ঞানীদের মনে একটি প্রশ্ন খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। প্রশ্নটি হোল, আগুন কি ? ক্যাভেনডিস মনে করতেন, যে কোন পদার্থের দাহ্য প্রকৃতি হোল 'ফ্লজিষ্টনে'র জন্য। যদিও 'ফ্লজিষ্টন' কি, তা কেউ জানেনা। দেখতে কেমন, তাও কেউ দেখেনি। তবু 'ফ্লজিষ্টন' মতবাদ সকলেই মেনে নিয়েছিলেন। এমন কি প্রিসলে ও একসময় এই তথ্যে বিশ্বাসী ছিলেন।

ল্যাভয়সিয়ের তখন লোহাতে কেন মরচে (Rust) ধরে এবং কেনই জিনিষ জ্বলে তাই নিয়ে গবেষণা করছিলেম। গন্ধক আর ফসফরাস নিয়ে তিনি পরীক্ষা করছেন তখন। লক্ষ্য করলেন পুড়ে যাওয়ার পরেও দাহ্য জিনিষের ওজন কমছে না, বরং বেড়ে যাচ্ছে। খুবই আশ্চর্য্য ব্যাপার। বহুদিন ধরে ধারণা ছিল কোন পদার্থ

দহনের সময় ফ্লজিষ্টন ক্ষয় হয়, ফলে পদার্থের ওজন কম হবে। কিন্তু পরীক্ষায় ঘটতে দেখা গেল তার বিপরীত। ফলে ফ্লজিষ্টন নিয়ে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস টলে গেল।

এর পরে ল্যাভয়সিয়ের তাঁর বিখ্যাত গবেষণা কাজে হাত দিলেন। তিনি একটি বকযন্ত্রে খুব সাবধানে সঠিক ভাবে ওজন করে পারদ নিলেন। বকযন্ত্রের মুখটা রাখা হোল এক বেলজারের মধ্যে। ঐ বেলজারের মধ্যে ৫০ কিউবিক ইঞ্চি বাতাস রাখা ছিল। বেলজারের মধ্যে যাতে আর হাওয়া ঢুকতে না পারে সেজন্য একটি পাত্রে পারদ নিয়ে, বকযন্ত্রের মুখ বেলজারের মধ্যে রেখে, বেলজারটি পারদ পাত্রের ওপরে রাখলেন।

তারপরে বকযন্ত্রের মধ্যের পারদ খুব সাবধানে গরম করতে আরম্ভ করলেন। পারদের কিছু অংশ লাল গুঁড়ো মত হয়ে গেল; তাছাড়া পারদ পাত্র থেকে কিছু পারদ বেলজারের মধ্যে একটু উঁচু স্তরে উঠে গেল।

বারোদিন এইভাবে চলতে থাকল পারদ-গরম করার পরীক্ষা। এবার দেখা গেল পারদ থেকে তো আর লাল গুঁড়ো সৃষ্টি হচ্ছে না। পাত্র থেকে পারদ আর বেলজারের মধ্যে উঠছে না। পরে মেপে দেখা গেল বেলজারের মধ্যে ১০ কিউবিক ইঞ্চি বাতাস কমে গেছে।

এবার তিনি পারদ গরম করে যে লাল গুঁড়ো পাওয়া গিয়েছিল, তাকে আলাদা করে বেশ ভাল ভাবে গরম করলেন। পারদ গুঁড়ো গরম করার সময়ে যে গ্যাস পাওয়া গেল, তা সাবধানে সংগ্রহ করলেন। পরে তিনি সেই গ্যাস ওজন করে হারিয়ে যাওয়া ১০ কিউবিক ইঞ্চি বাতাস ফিরে পাওয়া গেল।

এই পরীক্ষার ফল দেখে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে বাতাসের এক পঞ্চমাংশ পারদের সঙ্গে মিশে লাল গুঁড়ো তৈরী হয়েছে। তিনি জানালেন এই গ্যাস হোল অক্সিজেন।

ল্যাভয়সিয়ের রাসায়নিক পদার্থ পরিমাপের জন্য সূক্ষ্ম ওজন কল

তৈরী করলেন। তিনি বিজ্ঞানী মহলে বলতেন কোন রাসায়নিক পরীক্ষার সঠিকতা নির্ভর করে সঠিক মাপের ওপর তার জন্য অপরিহার্য্য সূক্ষ্মওজন যন্ত্র।

ল্যাভয়সিয়ের এক আশ্চর্য গবেষণা করে সে যুগের ধনীদের অবাক করে দিয়েছিলেন। তিনি জানালেন হীরা ও কয়লার উৎপত্তি সূত্র একই। কয়লা দহন করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পাওয়া যায়। আর হীরক শুধুমাত্র অক্সিজেনের মধ্যে দহন করলেও পাওয়া যাবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। তাহ'লে কি প্রমাণ হোল। হীরা ও কয়লার সৃষ্টি কার্বন থেকে এবং উভয়ের রাসায়নিক প্রকৃতি একই রকম।

ল্যাভয়সিয়ের ফিজিওলজি ও জৈব রসায়ন বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য নূন্যতম কতটা খাবার দরকার, শরীরের মৌলিক (basic) প্রয়োজন কত ক্যালরি, সে পরীক্ষার সূত্রপাত তিনিই করেন। সেই যুগে তিনি গিনিপিগ কতটা অক্সিজেন নিয়ে কত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করছে তাও সঠিকভাবে পরিমাপ করেছিলেন।

আমাদের শরীরে কেন তাপ সৃষ্টি হয়? আমরা যা খাই অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে দহন ক্রিয়া ঘটায় তার জন্যই তাপ সৃষ্টি।

এই ধরনের বহু গবেষণা তিনি করেছেন এবং সেই জন্য তাঁকে রসায়ন শাস্ত্রের জনক বলা হয়েছিল। হয়ত আরও অনেক গবেষণা তিনি করতেন যদি না তাঁতে ফরাসী বিপ্লবের সময় গ্রেপ্তার করা হোত। যখন তিনি গ্রেপ্তার হন তখন তিনি খাদ্য পরিপাকের পরে বর্জিত (waste product) বিষয়ে পরিমাপ ও গবেষণা করছিলেন।

ক্যাভেনডিস হাইড্রোজেন গ্যাসে আগুন দেওয়ার পরে পাত্রে যে জলকণা দেখা দেয় ল্যাভয়সিয়ের সে বিষয়েও পরীক্ষা করেছিলেন। তিনিও প্রমাণ করেছিলেন এটি হচ্ছে জল এবং জলের সৃষ্টি দুটি গ্যাসের মিশ্রণে—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন।

এর ফলে ফরাসী বিজ্ঞানীরা রেগে আগুন। যদিও ক্যাভেনডিস

১৭৮১ সালে বলেছেন জল দুটি গ্যাসের মিশ্রণে পাওয়া যায়। এই যাদুকর কি যা ইচ্ছে তাই বলবে? কি করে আমরা মেনে নেব যে জল ফ্লজিষ্টিক বিরোধী (anti phlogistic)। সেই জল কিনা তৈরী হয় এমন গ্যাসে যা সব চেয়ে সহজে জ্বলে। এ কি সম্ভব?

সত্যি এটা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার যে, হাইড্রোজেন যা এত ভাল জ্বলে, যাকে ল্যাভয়সিয়ের বলতেন দাহ্য বাতাস (inflamable air); আর অক্সিজেন যা ছাড়া আগুন জ্বলে না, সেই দুই গ্যাসের সংমিশ্রণে জল সৃষ্টি হয়।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ল্যাভয়সিয়ের আমেরিকানদের সাহায্য করেছিলেন। ফরাসী দেশের একটি প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বারুদ সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছিল। শেষে দেখা গেল তারা চুক্তি মত প্রয়োজনীয় বারুদ দিতে পারছে না। আর যে টুকু দিচ্ছে তার মান ছিল খুব খারাপ। তখন ল্যাভয়সিয়ের সরকারী পরিচালনায় বারুদ কারখানা তৈরী করেন এবং তিন বছরের মধ্যে দ্বিগুণ পরিমাণ বারুদ উৎপাদন করতে পেরেছিলেন।

সেই সময় ঐ বারুদ কারখানায় আইরিন ড্যু পোঁ নামে এক শিক্ষানবীশ ছিলেন। তার কাজে উৎসাহ ও পরিশ্রম ক্ষমতা ল্যাভয়সিয়ের খুশী হয়ে তাকে একটি কারখানা গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। আজ সেই কারখানা একটি বিশ্ববিখ্যাত রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান ই. আই. ড্যুপো দ্য নেমরস।

কৃষি কাজেও ল্যাভয়সিয়ের বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি বিদ্যা প্রয়োগ করে দেশের শস্য ফলন প্রায় দ্বিগুণ করতে পেরেছিলেন। কৃষি কাজে সার ব্যবহারের গুরুত্ব কি এবং পশু চারণের জন্য জমি আলাদা রাখার প্রয়োজনীয়তা তিনি দেশবাসীকে-বোঝাতে পেরেছিলেন।

তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গণতান্ত্রিক। তিনি ছিলেন ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। অভিমত ছিল,—সুখ-সাচ্ছন্দ অল্প কয়েকজনের

মধ্যে আবদ্ধ রাখা ঠিক নয়। প্রত্যেক মানুষের সাচ্ছন্দ্য দাবী করার অধিকার আছে।

১৭৮৯ সালে ল্যাভয়সিয়েরকে ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সের সভাপতি করা হয়। ঐ সময় তিনি মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য এক পরিকল্পনা পেশ করেন। সারা দেশের মানুষ তার জন্য তাঁকে অভিনন্দিত করে। ১৭৯১ সালে ঐ রিপোর্ট মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

তিনি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নতির জন্য জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ণ করেন,—যা এখনও ফরাসী দেশে প্রচলিত।

তাহলে প্রশ্ন আসে যে বিজ্ঞানী রসায়ন, জৈব রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, কৃষি বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে পণ্ডিত, তাঁর কেন এই শোচনীয় মৃত্যু ?

কারণ তিনি অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেন নি। জ্যাঁ পল মারাট নামে এক স্নাতকোত্তর ছাত্র রসায়ন বিজ্ঞানের একটি গবেষণা পত্র ফরাসী বিজ্ঞান একাডেমীতে জমা দিলেন। সেই গবেষণা পত্রের একটি পাঠান হয়েছিল ল্যাভয়সিয়েরের কাছে। গবেষণা পত্রটি নিম্নমানের ছিল বলে তিনি সেটি অনুমোদন করেন নি। যদি সেদিন তিনি মারাট'এর গবেষণা পত্র প্রত্যাখ্যান না করতেন তাঁকে হয়ত এভাবে মরতে হোত না।

বিপ্লবের সময় মারাট সন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দিয়ে ল্যাভয়সিয়ের ও সরকারী কর বিভাগের সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করিয়েছিলেন। মারাট সরকারী কর আদায়কারীদের দস্যু আখ্যা দিয়েছিলেন। বিভিন্ন জন সমাবেশে তিনি বলতেন, 'এই দস্যুরা জনগণের রক্ত শোষণ করছে। রক্ত দিয়ে এদের দেনা শোধ করতে হবে।'

জনগণের নাম করে সাধারণ অল্পশিক্ষিত মানুষকে ধোঁকা দেওয়া খুবই সহজ। মারাট তার ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটালেন জনগণের নামে জনমত তৈরী করে। দেশের বহু শিক্ষিত লোক, পণ্ডিতরা

ল্যাভয়সিয়েরকে মুক্তি দেওয়ার আবেদন করেছিলেন। অন্যেরা ছাড়া পেল; আটক রইলেন ল্যাভয়শিয়ের আর তাঁর শ্বশুর।

বহু মানুষ ভয়কে জয় করে 'বিচারকদের' কাছে আবেদন করে-ছিলেন, ল্যাভয়সিয়েরের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, দেশের জন্য অবদানের কথা বিবেচনা করে তাঁকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু আবেদনে কোন ফল হোল না। ১৭৯৪ সালে ৮ই মে গিলোটিনে তাঁর শিরঃচ্ছেদ করা হয়।

কারাগারের দিনগুলোতে ল্যাভয়সিয়ের কাজ করেছেন। মৃত্যুর অপেক্ষায় যখন তিনি দিন গুণছেন, সেই সময় 'মেময়ার ছ চিমি' বইটির পাণ্ডুলিপি শেষ করে তাঁর স্ত্রী মেরীকে দিয়েছিলেন। এবং তাঁর মৃত্যুর পরে মেরী সেই বই সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

মৃত্যুর সামনে থেকেও তিনি হতোদ্যম হননি; 'যতক্ষণ বেঁচে থাকব, কাজ করে যাব' এই ছিল তাঁর দর্শন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি, অর্থনীতি ও রাজনীতি সর্ববিষয়ে যাঁর জ্ঞান ছিল গভীর, এমন পণ্ডিত পৃথিবীতে কখনও আসেনি, পরে কখনও আসবে কিনা তা ভবিষ্যত জানে।

রেডিয়াম ও মাদামকুরী

কয়েকমাস আগে কলকাতায় এক বড় হাসপাতালে 'রেডিয়াম' সূচ হারিয়ে গিয়েছিল। তাই নিয়ে সারা হাসপাতালে তোলপাড় হয়েছিল; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বিভাগ থেকে বিজ্ঞানীরা হাসপাতাল চত্বর, ধাপায় ময়লা স্তূপে তন্ন তন্ন করে খুঁজে কয়েকটা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

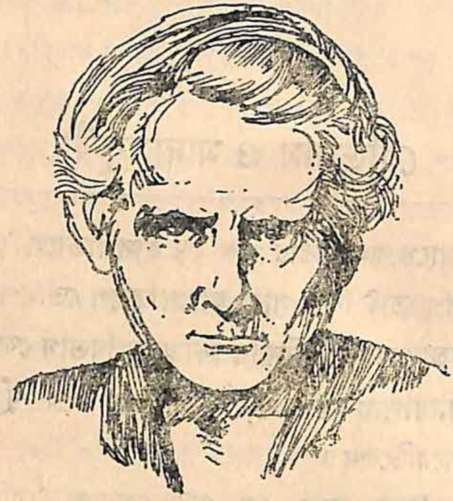
একটা সূচ খোঁজার জন্য এত চেষ্টা কেন? 'রেডিয়াম' কি? 'রেডিয়াম' কি ভাবে আবিষ্কার হয়েছিল? কে আবিষ্কার করেছিলেন? তা জানতে হলে আমাদের যেতে হবে অনেক বছর পিছনে।

পরিশুদ্ধ 'রেডিয়াম' আবিষ্কার হয়েছিল ফরাসী দেশে এক বিজ্ঞানী দম্পতির প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে। স্বামী অধ্যাপক পিয়েরকুরী ছিলেন ফরাসী নাগরিক, তাঁর স্ত্রী ম্যানায়া স্কেলোডোসকা ছিলেন পোলাণ্ডের মহিলা।

ম্যানায়া'র জন্ম হয়েছিল ১৮৬৭ সালে ৭ই নভেম্বর, পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস'তে। বাবা-মা দু' জনেই ছিলেন গরীব চাষী পরিবারের লোক। কিন্তু শিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন তাঁরা। সেইজন্য বাবা চাষ ছেড়ে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিলেন ওয়ারস হাইস্কুলে। পড়াতেন অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যা। মা খুব ভালো পিয়ানো বাজাতে পারতেন।

অভাব থাকলেও সুখে-শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল স্কোলোডোসকা পরিবার। কিন্তু সুখ তো কোথাও চিরকাল থাকে না। কয়েক বছরের মধ্যে তাদের সংসারে এলো ভীষণ বিপর্যয়।

ম্যানায়া'র বয়েস তখন দশ, মা মারা গেলেন যক্ষা রোগে। এতেই



মাদামকুরী

শেষ নয়, বাবার স্কুলের চাকরীটাও গেল, কারণ তিনি উচিত কথা বলতে ভয় পেতেন না। তখন পোলাণ্ড ছিল রাশিয়ার জার'এর দখলে। ম্যানায়া'র বাবা পোলাণ্ডের স্বাধীনতার দাবীতে আন্দোলন করার জন্য চাকরী হারালেন।

চাষের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন, এদিকে স্কুলের চাকরীও গেল, চারটি সন্তান নিয়ে খুব বিপদে পড়লেন মসিয়েঁ স্কোলোডোস্‌কা। কোন পথ না পেয়ে শেষে ছাত্রদের পড়ার জন্য একটা বোর্ডিং স্কুল খুললেন। তাতে অভাব না মিটলেও কোন রকমে সংসার চলতে লাগল।

ম্যানায়া যখন স্কুলের পাঠ শেষ করলেন, তখন তাঁর বয়স ১৬ বছর। পরীক্ষায় সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি স্বর্ণপদক পেলেন। সন্তানের শিক্ষায় সাফল্যের জন্য দুঃখের মধ্যেও মসিয়েঁ স্কেলোডোসকা-'র মনে শান্তি ছিল।

পরীক্ষার পরে মেয়েকে গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন, কিছুদিন বায়ু পরিবর্তন হবে, বিশ্রামও হবে। বাবার ভয় ছিল যদি মায়ে'র রোগ মেয়ের হয়।

গ্রামের মুক্ত পরিবেশে নাচ, গান আনন্দের মধ্যে কয়েকমাস কাটিয়ে আবার ওয়ারস'তে ফিরে এলেন ম্যানায়া।

তাঁর মনে এখন একটাই চিন্তা কি করে নিজের উচ্চশিক্ষার খরচ চালাবেন। এই অবস্থায় বাবার কাছ থেকে সাহায্যের কোন আশা নেই। দিদির সঙ্গে যুক্তি করলেন।

ঠিক হোল দিদি উচ্চ শিক্ষার জন্য প্যারী যাবেন। ম্যানায়া চাকরী ক'রে দিদির পড়ার খরচ চালাবেন আর দিদি ব্রোনিয়া পড়া শেষ হ'লে রোজগার করে বোনের পড়ার খরচ চালাবেন।

ব্যবস্থামত ব্রোনিয়া প্যারী গেলেন ডাক্তারী পড়ার বাসনা নিয়ে। ম্যানায়া এক রুশ জমিদার বাড়ীতে গভর্ণেসের চাকরী পেলেন। কিন্তু সে চাকরী কপালে সহ্য হল না, জমিদার গিন্নীর বাক্যবাণে অতিষ্ঠ হ'য়ে ম্যানায়া কাজ ছেড়ে দিলেন।

এ কাজটা ছাড়ার অল্পদিন পরেই আর একটা কাজ জুটে গেল। পরিবারের লোকজন সকলেই বেশ ভদ্র। বাড়ীর বড় ছেলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র।

ছুটিতে বড় ছেলে বাড়ী এলো, আলাপ হল ম্যানায়া'র সঙ্গে। দু'জনেই শিক্ষিত, ভদ্র ও রুচিশীল। দু'জনের মধ্যে ভালবাসা গড়ে উঠল। কিন্তু বিয়ের পথে বাধা হলেন ছেলের মা। বড় ঘরের ছেলের বিয়ে কি করে একটা গভর্ণেসের সঙ্গে হ'তে পারে? হোক না মেয়েটি ভদ্র ও লেখাপড়া জানা, তাই বলে গভর্ণেসের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে? কখনও না।

ভেঙ্গে পড়লেন ম্যানায়া। মন স্থির করলেন আত্মহত্যা করবেন। চিঠি লিখেলেন, 'আমি এই ঘৃণ্য পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমি না থাকলে কারও কোন ক্ষতি হবে না'……ইত্যাদি।

বিশ্বের সমস্ত মানুষের অশেষ সৌভাগ্য ম্যানায়া সেদিন তাঁর মনের সংকল্প কাজে পরিণত করেন নি। বিত্তবান ছেলেটির মাকে ধন্যবাদ, কারণ সেদিন ম্যানায়া আত্মহত্যা করলে বা তার বিয়ে হলে বিজ্ঞানের

ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হোত, বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়ত আরও দেরীতে হোত।

যাই হোক, ম্যানায়া ছাত্র পড়িয়ে যে টাকা পেতেন, তা পাঠিয়ে দিতেন দিদি ব্রোনিয়া'র কাছে প্যারিসে। শেষে ব্রোনিয়া সোর্বোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারী পাশ করলেন, আর বিয়ে করলেন এক সহপাঠীকে। ডেকে নিলেন ম্যানায়া'কে প্যারিসে।

ম্যানায়া'র বয়েস তখন ২৩ বছর। ফরাসী বানানে নাম নিলেন মেরী। ভর্তি হলেন সোর্বোর্ণের বিজ্ঞান কলেজে। থাকার জন্যে জুটলো চিলেকোঠার একটি ঘর। ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা নেই, শীতও ভীষণ। খাবার বলতে রুটি আর চা, অল্প মাখন। কোনদিন হয়ত তাও জুটতো না, সেদিন কাটত চেরী আর মুলো খেয়ে। কচিৎ কখনও হয়ত একটু মাংস বা ডিম জুটতো।

আবার বলব বিশ্বের সৌভাগ্য যে যক্ষ্মা রোগ গ্রস্থ মায়ের মেয়ে এত কষ্ট থেকেও রোগে পড়েন নি। এর মধ্যে ল্যাবরেটারীর বোতল ধুয়ে দু'পয়সা উপরি আয় করতেন। তারপরে পড়া। বিষয় কি? অঙ্ক, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা জ্যোর্তিবিজ্ঞান কবিতা ও গান। এ কি সম্ভব? কিন্তু মেরীর পক্ষে সবই সম্ভব। পরীক্ষায় দেখা গেল পদার্থবিদ্যায় তিনি প্রথম হয়েছেন। পরের বছর অঙ্ক পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থানে।

লেখাপড়ার পর্ব শেষ হোল। তাঁর বয়েস তখন ২৭ বছর। এত অভাব, এত পরিশ্রমের মধ্যে তাঁর সৌন্দর্য্য কিন্তু একটুও কমে নি। তবে বিয়ের চিন্তা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলেছেন, কারণ দশ বছর আগের ক্ষত মন থেকে এখনও মুছে যায় নি।

তবে মানুষের ইচ্ছে মত সব সময় সব কিছু ঘটে না। মেরীর ক্ষেত্রেও ঘটেনি। জীবনের চাকা অন্য পথে ঘুরে গেল। ঘটনাক্রমে তাঁর আলাপ হোল ৩৫ বছর বয়সের বিজ্ঞানী পিয়ের কুরী'র সঙ্গে।

পিয়ের ২২ বছর বয়সে লিখেছিলেন, 'প্রতিভাবান মেয়ে প্রায় দেখা যায় না, আর সাধারণ মেয়ে বিজ্ঞানীর কাজে বাধা সৃষ্টি করে।'

পিয়ের বিজ্ঞানে স্নাতক হয়েছিলেন মাত্র ১৬ বছর বয়সে। দু'বছর পরে পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেলেন তিনি। পরীক্ষা পাশের পরে তিনি চুম্বক-বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন।

মেরীর সঙ্গে পিয়েরে'র আলাপ হোল এক পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপকের বাড়ীতে। পোলাণ্ড থেকে এক পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক সেই সময় প্যারিসে এসেছিলেন। পিয়ের মেরীকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে উপদেশ দিলেন। পিয়েরের কথা মত মেরী অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করলেন। তার কিছুদিন পরে মেরী অধ্যাপকের ল্যাবরেটারীতে যোগ দিলেন গবেষণার জন্য। পিয়েরও তখন ঐ ল্যাবরেটারীতে বিদ্যুৎ নিয়ে কাজ করছেন।

পিয়ের মেরীর কার্যপদ্ধতির মধ্যে প্রতিভার সন্ধান পেয়ে তাঁকে তাঁর গবেষণার সহযোগী করে নিলেন। পরের বছর মেরী স্কোলোডোসকা হলেন মেরী কুরী।

কিন্তু পরে অধ্যাপক হেনরী বেকরেল'এর কাছে একটি খবর পেয়ে তাঁদের গবেষণার বিষয় বদলে গেল। অধ্যাপক বেকরেল তখন বিশেষ পদার্থের আলো বিকিরণ শক্তি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। সেটা হোল ১৮৯৬ সাল। তার এক বছর আগে জার্মান অধ্যাপক রয়েনজেন অদৃশ্য আলোক রশ্মি আবিষ্কার ক'রে বিজ্ঞান জগতে ঝড় তুলেছেন। বেকরেল তখন পিচব্লেণ্ড নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি দেখতে পেলেন পিচব্লেণ্ড রৌদ্রে রাখার পরে অন্ধকারেও বিকিরণ করে। রয়েনজেনে'র গবেষণার সূত্র ধরে তিনি স্থির করলেন ফোটো তোলার প্লেটের ওপর পিচব্লেণ্ড কি প্রতিক্রিয়া করে তা লক্ষ্য করতে হবে। ফোটো প্লেট, পিচব্লেণ্ড আনা হোল, কিন্তু বৃষ্টি-বাদলের দিন হওয়ায় বেকরেল ফটো প্লেট ড্রয়ারে তুলে রাখলেন। কয়েকদিন পরে দেখা গেল ফোটো প্লেটে সূর্যালোকের চেয়ে বেশী আলো বিকিরণ হয়েছে। আকস্মিকভাবে বোঝা গেল পিচব্লেণ্ডে তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে। পরে আরও গবেষণা করে জানা গেল এই তেজস্ক্রিয় জিনিষটি হোল—'ইউরেনিয়াম।'

কিন্তু ইউরেনিয়াম' নিষ্কাশনের পরেও পিচব্লেণ্ডে তেজস্ক্রিয় প্রকৃতি তো কমল না। তাহলে কি পিচব্লেণ্ডে অন্য কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ 'ইউরেনিয়াম' নিষ্কাশনের পর থেকে গেল।

বেকরেল এই সমস্যা নিয়ে মেরী কুরী'র সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। কারণ মেরী কুরী'র কাজের পদ্ধতি দেখে তার বিশ্বাস জন্মেছিল মেরী তাঁকে সাহায্য করতে পারবেন।

মেরী তখন পরামর্শ করলেন পিয়েরে'র সঙ্গে। তাঁদের মনে ধারণা হোল পিচব্লেণ্ডে অবশ্যই নতুন কোন জিনিষ আছে তবে সেটি যে কি, তা কেউ জানে না। হাতের কাজ চেপে রেখে তু'জনে পিচব্লেণ্ড নিয়ে কাজ করতে মনস্থির করলেন।

কিন্তু সমস্যা হোল কোথায়, কিভাবে পিচব্লেণ্ড পাওয়া যাবে। অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ছাড়া ইউরোপের অন্য কোথাও তখন পিচব্লেণ্ড পাওয়া যেত না। দামও খুব বেশী।

শেষে আলোচনা করে তু'জনে লিখলেন অস্ট্রিয়া সরকারের কাছে—'ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনের পর যে পিচব্লেণ্ড আবর্জনা হিসেবে ফেলে দাও তা যদি আমাদের দাও, বাধিত হবো।'

অস্ট্রিয়া সরকার খুশী মনে শুধু মালবহনের খরচ নিয়ে ওয়াগন ভরে পিচব্লেণ্ড পাঠালেন। তাদের কাছে ঐ পিচব্লেণ্ড তখন এক সমস্যা। তবে তারা যদি জানতেন এই আবর্জনার মধ্যে কি সম্পদ আছে তাহ'লে তারা কখনও পাঠাতেন না।

কয়েকটন পিচব্লেণ্ড আবর্জনা এসে গেল। এখন এই আবর্জনার স্তূপ রাখা হবে কোথায়? বাড়ীর পিছন দিকে কাঠের চালা ঘরে আবর্জনা জমা হোল। তবে চালের ছাদ ফুটো, তার জন্য উনুন বসল বাড়ীর ভিতরে। উনুনে বিরাট কড়া চাপিয়ে পিচব্লেণ্ড বিশোধন করা হতে থাকল। ঘরে ভীষণ ধোঁয়া। একটন পিচব্লেণ্ড বিশোধন করা সহজ ব্যাপার নয়, অনেক সময় লাগে। সুতরাং বিজ্ঞানী দম্পতি ঘর ছেড়ে বাড়ীর পিছনের উঠোনে উনুন পাতলেন। বিজ্ঞানের

কোন গবেষণা এই ধরনের ল্যাবরেটারীতে হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

এইভাবে চলল ১৮৯৬ সালের শীত পর্যন্ত। মেরী নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হলেন। তখন পিয়ের একাই পিচব্লেণ্ড সিদ্ধ করার কাজ করতে লাগলেন। তখনকার দিনে নিউমোনিয়া রোগের কোন ওষুধ ছিল না। দীর্ঘ তিন মাস রোগে ভুগে মেরী সুস্থ হয়ে আবার কাজে যোগ দিলেন।

১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর। মেরীর কাজে আবার ছেদ পড়ল। এই সময়ে তাঁদের প্রথম মেয়ে আইরিনের জন্ম হল।* তবে মেরী বিশ্রাম না নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যেই গবেষণার কাজে যোগ দিলেন। পিয়েরের মনে ভয় ছিল শিশুকন্যার দেখা শোনা করতে মেরী'র হয়ত কাজে যোগ দিতে দেরী হবে।

সমস্যার সমাধান করে দিলেন শিশুর দাদু, পিয়েরে'র বাবা। অল্পদিন আগে বৃদ্ধের পত্নী বিয়োগ হয়ে জীবনের অবলম্বন ছিঁড়ে গিয়েছিল। শিশু নাতনীর দেখাশোনা করার দায়িত্ব পেয়ে তিনি যেন বেঁচে থাকার সূত্র পেলেন।

কন্যার জন্মের পরে অল্পদিন বিশ্রামের অবসরে মেরী'র মনে নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষার কথা মনে এসেছিল। বোধহয় সেইজন্য তিনি দীর্ঘদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে পারেননি। নতুন ভাবে পরীক্ষা ও গবেষণার ফল পাওয়া গেল দীর্ঘ দু'বছর পরে—পিচব্লেণ্ড থেকে খুব সামান্য পরিমাণ যৌগিক বিসমাথ পাওয়া গেল। এই বিসমাথ ইউরেনিয়ামের চেয়ে তিনশ গুণ বেশী তেজস্ক্রিয়। কিন্তু বিসমাথ

---

* কুরী দম্পতির বড় মেয়ে আইরিন পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী হিসেবে বিশ্ব-বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি ও তাঁর স্বামী ফ্রেডারিক জোলিও কুরী ১৯৩৫ সালে, তাঁর মায়ের মৃত্যুর পরের বছরেই মৌলিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ সংশ্লেষণ করে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ফ্রেডারিক বিবাহের পরে 'কুরী'দের পদবী নিজের নামে ব্যবহার করতেন।

নিষ্কাশনের পরেও পিচব্লেণ্ডের তেজস্ক্রিয়তা কমল না। এরপরে মেরীর মনে স্থির ধারণা হল পিচব্লেণ্ডে ইউরেনিয়াম ও বিসমাথ ছাড়া অজানা আরও তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে।

১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে পিচব্লেণ্ডে আরও একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেল। মেরী নিজের ফেলে আসা মাতৃভূমি পোল্যাণ্ডের নাম অনুসারে এই নতুন পদার্থের নাম দিলেন 'পোলেনিয়াম'।

নতুন আবিষ্কার করে কিন্তু কুরী দম্পতি খুশী হতে পারলেন না। কারণ পিচব্লেণ্ড থেকে 'পোলেনিয়াম' নিষ্কাশনের পরে তার তেজস্ক্রিয় প্রকৃতি যেন আরও বেড়ে গেল। তাহলে ঐ পিচব্লেণ্ডে নিশ্চয় আরও তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে। সেটা কি?

আরও পরীক্ষা, আরও পরিশুদ্ধিকরণ চলতে থাকল। শেষে পাওয়া গেল সাদা নুনের মত অল্প পরিমাণ গুঁড়ো, যা দেখা গেল অন্ধকারেও আলো বিকিরণ করে। এই গুঁড়ো পদার্থের নাম দেওয়া হল 'রেডিয়াম।'

'রেডিয়াম' ভীষণ দামী। দুই আঙ্গুলের মধ্যে যে পরিমাণ 'রেডিয়াম' নেওয়া যায়, তা পিচব্লেণ্ড থেকে শুদ্ধ অবস্থায় পাওয়ার জন্য এক ওয়াগন পিচব্লেণ্ড দরকার। অধ্যাপক কু'রীর মতে দু' পাউণ্ড 'রেডিয়াম' পেতে হলে পাঁচ হাজার টন পিচব্লেণ্ড শোধন করতে হবে। তা ছাড়া খুব বেশী জায়গায় পাওয়াও যায় না। ইউরোপে চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া ছাড়া নরওয়ে, আফ্রিকার মিশরে, আমেরিকার উত্তর ক্যারোলিনা, কলেরেডো ও উটা প্রভৃতি স্থানে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। কোন কোন সোনা, রূপা ও অভ্র খনিতে সামান্য পরিমাণে থাকতে পারে। তাছাড়া পিচব্লেণ্ড বিশোধন করা খুবই কষ্ট সাধ্য। এই প্রক্রিয়ায় সময় লাগে প্রায় ছ' মাস।

তেজস্ক্রিয় প্রকৃতির জন্য 'রেডিয়াম' প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষতি করে। ইঁদুর, গিনিপিগের শরীরে 'রেডিয়াম' বিকিরণ করে দেখা গিয়েছে যে

প্রথমে তাদের শরীরের লোম ঝরে যায়, পরে অন্ধত্ব আসে। তার পরে প্রাণী মরে যায়। এদিকে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বীজের ওপর 'রেডিয়াম' বিকিরণ করে দেখা গিয়েছে যে সেই বীজ থেকে নতুন চারা সৃষ্টি হয় না।

কোন মানুষ ভুল করে পকেটে যদি 'রেডিয়াম রাখে তাহলে দেখা যাবে যে পকেট সংলগ্ন চামড়া প্রথমে লাল হয় এবং পরে শরীরের ঐ জায়গা পুড়ে সেখানে একটি ক্ষত সৃষ্টি হয়। সেই ক্ষত সহজে সারতে চায় না। বেশীদিন 'রেডিয়ামে'র সংস্পর্শে থাকলে মজ্জার রোগ সৃষ্টি হয়, যা থেকে পরে রক্তাল্পতা হতে দেখা যায়। বেশী পরিমাণে বিকিরণ হলে 'ক্যানসার' রোগ হতে দেখা যায়। আর আশ্চর্য ব্যাপার হল 'ক্যানসার' রোগ চিকিৎসার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে 'রেডিয়াম' ব্যবহার করা হয়। এর একটি বিশেষত্ব হল দীর্ঘস্থায়ী বা চিরস্থায়ী বিকিরণ ক্ষমতা।

এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের পরে কুরী দম্পতির নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। আবিষ্কারের সুযোগ নিয়ে ব্যবসা করার জন্য বহু প্রস্তাব এলো, কিন্তু তাঁরা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য কুরী দম্পতি ও অধ্যাপক বেকেরেল ১৯০৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন। পুরস্কারের টাকাটা হাতে পেয়ে তাঁদের খুব উপকার হল। কারণ গবেষণার কাজে কুরী দম্পাতির বাজারে অনেক দেনা হয়ে গিয়েছিল, এই টাকায় সেটা শোধ করা সম্ভব হল।

পিয়ের কুরী সোর্বোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। অনেক দুঃখ কষ্টের পর যেন একটু স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদ অনুভব করলেন তাঁরা। কয়েকমাস পরে ১৯০৪ সালে ছোট মেয়ে ইভের জন্ম হল।

কিন্তু সুখ তো চিরস্থায়ী হয় না। কুরীদের এই সুখ ছিল স্বল্পস্থায়ী। এক ভীষণ দুর্ঘটনায় তাদের পরিবারে বিপর্যয় নেমে এলো। ১৯০৬ সালের ১৯শে এপ্রিল বৃহস্পতিবারের সকালে পিয়ের

হাতে কাজ নিয়ে বেরোলেন! সকলে থেকেই গুমোট অন্ধকার, অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ী থেকে বেরোবার আগে পিয়ের মেরীকে ডাকলেন। বৃষ্টির আওয়াজে মেরী শুনতে পেলেন না। তিনি তখন আইরিন ও ইভের জামা বদলে দিচ্ছিলেন।

দুপুরে পিয়ের সায়েন্স ফ্যাকালটিতে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা সেরে প্রকাশকের বাড়ীর দিকে চললেন, প্রুফ সংশোধন করতে হবে। প্রকাশকের দরজা বন্ধ, ধর্মঘট চলছে। মেঘলা আকাশের দিকে চেয়ে ছাতি খুলে পথে নেমে পড়লেন অবিশ্রাম বৃষ্টি উপেক্ষা করে।

শহরের ঐ অংশে ভীষণ ভীড় রাস্তাও পাথরের ইটের তৈরী, এবড়ো-খেবড়ো। মনে কি ভাবতে ভাবতে একটা বন্ধ গাড়ীর পিছনে হাঁটছিলেন। বিপরীত দিকে থেকে একটা ট্রাম পার হয়ে গেল। রাস্তা পার হবার জন্য এগিয়ে গেলেন অধ্যাপক কুরী। হঠাৎ ঘোড়ায় টানা একটা বিরাট মাল গাড়ী পুলের ওপর থেকে দ্রুত গতিতে ছুটে এলো। আত্মরক্ষার চেষ্টায় তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পিছল ও অসমান পাথুরে রাস্তায় পড়ে গেলেন। রাস্তার লোক চীৎকার করে উঠলো, কোচম্যান লাগাম টেনে ধরেও গাড়ী থামাতে পারল না। মাল গাড়ীর সামনের চাকা দুটি পার হয়ে গেল কিন্তু পিছনের চাকা তাঁর মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। মাথা ফেটে মস্তিষ্ক ছিটকে এলো রাস্তায় কাদায়। এই দুর্ঘটনায় ড্রাইভারের কোন হাত ছিল না—যদিও লোকে তাকে গালমন্দ করতে লাগল।

পকেটের কাগজ পত্র পরীক্ষা করে পুলিশ জানতে পারল হতভাগ্য পথচারী কে? তখন জনতা ক্রোধে ফেটে পড়ে ড্রাইভারকে আক্রমণ করতে গেল, অবশ্য পুলিশ তাকে রক্ষা করে।

অল্পক্ষণে খবর ছড়িয়ে পড়ল। পিয়ের বাড়ীর পাশে ঘোড়ার গাড়ী, মোটর গাড়ী জমতে লাগল। রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি খবর জানাতে এলেন; মেরী বাড়ী নেই শুনে ফিরে গেলেন। এর

পরেই এলেন ফ্যাকাল্টির প্রধান অধ্যক্ষ। তিনিও মেরী বাড়ীতে নেই শুনে পিয়েরের বাবা ডাঃ কুরীর সামনে দুর্ঘটনার কথাটি বলতে না পেরে চুপ করে রইলেন।

বৃদ্ধ আন্দাজ করলেন, কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলে ফেললেন, 'বুঝেছি পিয়ের মারা গেছে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন বৃদ্ধ পিতা।

ছটায় বাড়ী ফিরলেন মেরী তিনি তখনও কিছু শোনেন নি। হাসি মুখে ঘরে ঢুকে আগন্তকদের মুখ দেখে তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

সব শুনে, স্তব্ধ হয়ে মাটিতে বসে পড়লেন মেরী। কাঁদলেন না একটুও; শুধু ফিসফিস করে বললেন, আমার পিয়ের মারা গেছে!'

দুই মেয়ে মা'র পাশে এসে দাঁড়াল। তারা একটু আগে বাগানে খেলা করছিল। অবস্থা দেখে তারা অবাক হয়ে গেছে, যদিও কিছু বুঝতে পারছে না। জোরে মেয়েদের আঁকড়ে ধরলেন মেরী। আটকে থাকা অশ্রু বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার মত নেমে এলো।

২১শে শনিবার সকালে কুরীদের সো'-র বাড়ীতে মায়ের সমাধির পাশে পিয়ের'কে সমাহিত করা হল।

গত বছর তিন ছাড়া মেরীর সারাজীবন তো দুঃখ আর অভাবের মধ্যে কেটেছে। কিন্তু তার জন্য তিনি কখনও ভেঙ্গে পড়েন নি। এবারও তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। মনকে শক্ত করলেন, মেয়ে দুটিকে বড় করতে হবে, মনের মত মানুষ করতে হবে। বৃদ্ধ শ্বশুরকেও সামলাতে হবে। তিনি একেবারে অসহায়। ছোট ছেলে জ্যাক থাকে অন্য জায়গায়।

শোক ভুলে থাকার জন্য গবেষণা কাজ আরম্ভ করলেন। সোর্বোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তাব এলো পিয়েরের অধ্যাপক পদটিতে মেরীকে নিয়োগ করা হোক। প্রতিবাদ এলো নানা দিক থেকে। একটা মেয়ে হবে কিনা এত বড় ঐতিহ্যপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক। এতো ভাবা যায়

না। মেরী আবার বৈজ্ঞানিক কি করে হল। নোবেল প্রাইজ পেয়েছে তো কি হয়েছে? আসল কাজ তো করেছিলেন পিয়ের; তবে হ্যাঁ, মেরী তাকে অল্প সল্প সাহায্য করেছিলেন।

কিন্তু সব প্রতিবাদ উপেক্ষা করে অধ্যাপক পদটি মেরীকে দেওয়া হল। বৈজ্ঞানিক মহলের অভিমত ছিল যে পিয়ের ও মেরী যে গবেষণা করেছিলেন এখন একমাত্র মেরীর পক্ষেই তার ছিন্ন সূত্র জুড়ে নেওয়া সম্ভব। ১৯০৬ সালের ১৩ই মে অধ্যাপক বৃন্দ স্থির করলেন পিয়েরের মৃত্যুতে শূন্য অধ্যাপক পদে ডঃ মেরীকে নিয়োগ করা হোক।

সেই মত ডঃ মেরী কুরীর কাছে প্রস্তাব এল। 'বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক মণ্ডলীতে গবেষণা কার্যের প্রধান পরিচালিকা হিসাবে ঐ বিভাগের পদার্থ বিদ্যা শিক্ষকতার দায়িত্ব দেওয়া হল। এই নিয়োগ ১লা মে হতে কার্যকর হবে এবং এই কাজের জন্য বাৎসরিক ১০,০০০ ফ্রাঙ্ক পারিশ্রমিক ধার্য্য করা হল।'

ফরাসী দেশে উচ্চশিক্ষা বিভাগে প্রথম নারী এই দায়িত্ব পেলেন। শ্বশুরের মুখে এই কঠিন দায়িত্ব পাওয়ার কথা শুনে তিনি, ছোট্ট উত্তর দিলেন, 'আমি চেষ্টা করে দেখব।'

অধ্যাপিকা মেরী প্রমাণ করলেন বৈজ্ঞানিক হিসেবে তিনি ছোট নন। নিরলস ও কঠোর পরিশ্রম করে তিনি 'রেডিয়াম' আরও বিশুদ্ধ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। তরল 'রেডিয়াম ক্লোরাইডের' ভিতর দিয়ে তিনি বিদ্যুৎ তরঙ্গ চালনা করলেন। দেখা গেল পারদ মিশ্রিত 'রেডিয়াম' উপাদান নেগেটিভ প্রান্তে জমা হয়েছে। পরে সেই পারদ মিশ্রিত উপাদান আগুনে ফুটিয়ে নিলে পারদ উবে যায় এবং যা পড়ে থাকে তা হল বিশুদ্ধ 'রেডিয়াম'। এই গবেষণার জন্য তিনি দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার পেলেন ১৯১১ সালে, এবার রসায়নে। ঈর্ষাপরায়ণ নিন্দুকদের মুখ বন্ধ হল।

বিশ্বের নানা দেশ থেকে পদক, সম্মানপত্র অভিনন্দন আসতে লাগল, কিন্তু তার মধ্যেও স্বামীর অভাব ভুলতে পারেন নি। যতদিন

পেরেছেন রোজ ডায়েরী লিখতেন পিয়েরের উদ্দেশে। শেষে ১৯৩৪ সালের মে মাসে তিনি গুরুতর রোগে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই অবস্থাতেও তিনি আইরিন ও জামাই জোলিওকে উপদেশ দিতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল এই কাজের জন্য ওরাও নোবেল প্রাইজ পাবে। ওরা পেয়েছিল ঠিক, তবে মেরীর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে।

রোগ শয্যায় ছোট মেয়ে ইভ, মা'কে আগলে রাখতেন। প্রথমে চিকিৎসকরা ভেবেছিলেন মেরীর এই জ্বর ও দুর্বলতা বোধ হয় যক্ষ্মা রোগের জন্য। পরে দেখা গেল, তা নয়, তার হয়েছিল এপ্লাসটিক পার্নিশাস এনিমিয়া। বহুদিন তেজস্ক্রিয় রশ্মির সংস্পর্শে আসায় তাঁর অস্থিমজ্জায় যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার ফলে নতুন রক্তকণিকা সৃষ্টি হত না। যে পদার্থের সন্ধান তিনি আজীবন করেছিলেন, সেই পদার্থের শিকার হলেন মেরী।

অবশেষে ১৯৩৪ সালের ৪ঠা জুলাই পোল্যাণ্ডের দরিদ্র গভর্ণেস, পরবর্তীকালে বিশ্বের নজিরবিহীন মহিলা বিজ্ঞানী, পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পরে সো তে পিয়ের কুরীর কফিনের ওপর তাঁর কফিন রাখা হয়। ভগিনী ব্রোনিয়া ও ভাই জোসেফ পোল্যাণ্ড থেকে নিয়ে আসা দু'মুঠো মাটি কবরের মধ্যে ফেলে দিলেন। পিয়েরের সমাধিস্তম্ভে তার নামও খোদাই করে রাখা হল।

রোগের প্রথম অবস্থায় যে বইটি লেখা তিনি শেষ করেছিলেন— মৃত্যুর এক বছর পরে সেই বিরাট বইটি প্রকাশিত হল। বইটির নাম 'রেডিও এ্যাকটিভিটি।'

পৃথিবীতে বহু বিজ্ঞানী এসেছেন। এ শতকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন বহু বিজ্ঞানী। কিন্তু বিশ্বে একজন মহিলা বিজ্ঞানীর দু'বার নোবেল পুরস্কার পাওয়া এবং একই পরিবারে স্বামী-স্ত্রী, কন্যা-জামাতা'র নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ঘটনা আর কখনও দেখা যাবে বলে মনে হয় না।

কুষ্ঠরোগ : ড্যানিয়েলসেন ও হ্যানসেন

কুষ্ঠরোগ ; নামটা শুনলেই ভয় লাগে। এখনও বহুলোকের ধারণা, এ-রোগ কখনও সারে না। এই রোগ মানুষের শরীর ভীষণভাবে বিকৃত হয়। সমাজে তাদের ঠাঁই হয় না। তাদের অথিকাংশের জায়গা হয় পথেঘাটে ; বিশেষভাবে মন্দির-মসজিদের আশ-পাশে। মানুষের করুণার উপর নির্ভর ক'রে ভিক্ষার অন্নে তাদের জীবন কাটে।

প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বাস, কোনো পাপের ফল ভোগ করছে তারা। ভগবানের অভিশাপেই তাদের এই অসুখ।

আগেকার দিনে কুষ্ঠরোগীদের দশা

আমাদের পুরাণ ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এই রোগের উল্লেখ আছে। খ্রীশ্চান কাহিনীতেও আছে এই রোগের বিবরণ। সুতরাং বোঝা যায়, এই রোগ প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে।

সেকালে কুষ্ঠরোগীদের জনবসতির বাইরে, পাহাড়ের গুহায় দিন কাটাতে হোত, যতদিন না মৃত্যু এসে তাদের মুক্তি দেয়। পাহাড়ের ওপর থেকে খাবারের টুকরো ছুঁড়ে ফেলা হোত। যারা শক্ত-সমর্থ তারা কিছু খেতে পেত। যাদের স্নায়ু নষ্ট হয়ে চলাফেরার ক্ষমতা থাকত না যাদের হাত-পায়ের আঙ্গুল ক্ষত হয়ে নষ্ট হয়ে যেত, তারা অনেক সময় খেতে পেত না।

এইভাবে রোগে ভুলে বা অনাহারে তাদের মরতে হোত। যদি কেউ পেটের জ্বালায় বা রোগের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে গুহা ছেড়ে বাইরে আসতো, গ্রামের লোকের ঢিলের ঘায়ে মরতে হোত তাদের। এইভাবে তাদের অভিশপ্ত জীবন কাটতো।

কেউ তাদের কথা ভাবতো কিনা জানি না ; এই রোগে চিকিৎসাও কিছু ছিল না, প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু তাতে কোন ফল পাওয়া যেত না। যাবে কি ক'রে - রোগের কারণটাই তো ছিল আজানা !

* *

ড্যানিয়েলসন

শেষে এই হতভাগ্যদের সাহায্য দিতে এগিয়ে এলেন নরওয়ে'র এক চিকিৎক, ড্যানিয়েলসেন। ১৮১৭ সালে এক ঘড়ি-মিস্ত্রির ঘরে তাঁর জন্ম। সেযুগে একটা শহরের ঘড়ি-মিস্ত্রি কতই বা আয় করতে পারত। বাবা যা রোজগার করতেন তাতে সংসারের অভাব মিটত না। অগত্যা ড্যানিয়েলসেন লেখাপড়া ছেড়ে চাকরী নিতে বাধ্য হলেন এক ওষুধ-কারখানায়। তখন তাঁর বয়স মাত্র তের বছর।

বছর চারেক তিনি কারখানায় কাজ করলেন। তার পরে কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন, কারণ তাঁর উরুসন্ধি (hip joint)-তে যক্ষ্মারোগ হয়েছিল। বছর দু'য়েক চিকিৎসার ফলে তিনি কিছুটা সুস্থ হলেন বটে, কিন্তু তাঁকে সারাজীবনের মতো খোঁড়া হতে হল।

যাতে তাঁর দুর্বলতা ধরা না পড়ে সেইজন্য তিনি নিজেকে লোক-চক্ষুর আড়ালে রাখতে চাইতেন। রোগশয্যায় তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে নিজে থেকে পড়া আরম্ভ করলেন। শুয়ে থেকেও তিনি সময়টাকে নষ্ট করতে চান নি। নিজের চেষ্টায় তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়া শেষ করলেন। তারপর নরওয়ের রাজধানী ওসলো থেকে চিকিৎসা-বিজ্ঞান পরীক্ষা পাশ করলেন। তখন তাঁর বয়েস তেইশ বছর।

চিকিৎসা করার অধিকার অর্জনের পর তিনি পয়সা রোজগারের চেষ্টা না ক'রে গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। আর বিষয় হিসেবে বেছে নিলেন কুষ্ঠরোগ। মনে রাখতে হবে, যে-রোগের নাম

শুনলে মানুষ ভয় পায়, রোগীদের এড়িয়ে চলে, ড্যানিয়েলসেন সেই রোগ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন ; আর তখন তাঁর বয়েস পঁচিশ পার হয়নি।

এই কাজে তিনি সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলেন কার্ল বোয়েক নামে আর-একজন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীকে। দু'জন মিলে কুষ্ঠরোগ বিষয়ে দু'টি বই লিখলেন, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কুষ্ঠরোগ নিয়ে এর আগে আর কেউ বই লেখেন নি।

ড্যানিয়েলসেন গবেষণাক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিলেন নরওয়ের উত্তরে একটি শহর, নাম বার্জেন। এই সময়ে গবেষক হিসেবে তিনি এক দারুণ দুঃসাহসের কাজ করেন। উদ্দেশ্য, কুষ্ঠরোগ মানুষের শরীরের কোন্ যন্ত্রের কোন্ অংশে ক্ষতি করে তা ঠিকভাবে জানতে হবে। কুষ্ঠরোগ তো শুধু চামড়ায় হয় না। মানুষের হাত ও পায়ের আঙ্গুলে, নাকে, চোখে ক্ষত সৃষ্টি করে। আঙ্গুল খসে যায়, চোখ অন্ধ হয়, নাকে ক্ষত হয়ে বসে যায়, পায়ের তলায় ঘা হয়, কেন? চামড়ার তাপের কোন অনুভূতি থাকে না, কেন? স্নায়ুতে কি রোগ হয়? এমনি নানা প্রশ্ন এলো তাঁর মনে।

সেইজন্য যেসব কুষ্ঠরোগী মারা যেত, তিনি তাদের শব-ব্যবচ্ছেদ করে দেখতেন শরীরের ভিতরে কতটা ক্ষতি হয়েছে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কেটে নিয়ে, আরক-এ ভিজিয়ে কাঁচের জারে রেখে দিতেন। ভবিষ্যতে যাঁরা গবেষণা করবেন, তাঁদের সুবিধে হবে, ভেবে।

কিন্তু কাজটা ছিলো ধর্মীয় বিধানের বিরোধী। সে-যুগে মানুষের ধারণা ছিল, মৃতের শরীর বিকৃত করলে বিধাতার অভিশাপ নেমে আসবে। বার্জেনের মানুষ ইচ্ছে করলে ড্যানিয়েলসেনকে বাধা দিতে পারতো, শাস্তি দিতে পারতো। কিন্তু তারা বুঝেছিল, মানুষের ভালো করার জন্য তিনি এই গুরুতর ঝুঁকি নিয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধজ্ঞান যেন ভবিষ্যতে কুষ্ঠরোগীদের উপকারে আসে। তাঁর সেদিনের ব্যবচ্ছেদ করা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নমুনা বার্জেনে'র এক

পুনর্বাসন কেন্দ্রের মিউজিয়ামে আজও সুরক্ষিত আছে আরক-এ ভিজনো অবস্থায় কাঁচের পাত্রে।

ড্যানিয়েলসেন ভেবেছিলেন কুষ্ঠ বংশগত রোগ— নিজের দেহেবিষ নিয়েছিলেন

গবেষণা-কাজে ড্যানিয়েলসেন আর এক ভীষণ দুঃসাহসের কাজ করেছিলেন। তাঁর মনে বিশ্বাস ছিল যে কুষ্ঠরোগ বংশগত। তিনি মনে করতেন, এই রোগ বংশের প্রথম ও তৃতীয় পুরুষকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পুরুষকে বেশী আক্রমণ করে। কিন্তু লোকে তাঁর কথা বিশ্বাস করেনি। তখন তিনি এই রোগ যে বংশগত তা প্রমাণ করার জন্য নিজে ও তাঁর গবেষণাকেন্দ্রের কয়েকজন সহকারী কুষ্ঠরোগীর ক্ষত থেকে তন্তুরস নিষ্কাশন ক'রে নিজেদের দেহে ইনজেকশন দিলেন। পৃথিবীতে এই ধরনের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার নজির বেশী নেই। বহু বছর আগে (১৭৯৬ সালে) জেনার গো-বসন্তের বীজ জন ফিপ্‌স্ নামে এক বালকের দেহে প্রবেশ করিয়েছিলেন এবং পরে সেই বালকের শরীরে বসন্তের বীজ প্রবেশ করিয়েছিলেন। এর জন্য জেনার'কে দেশে কিরূপ সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। হাণ্টার নামে আর-এক চিকিৎসা-বিজ্ঞানী রোগীর তন্তুরস ও পুঁজ নিজের শরীরে লাগিয়েছিলেন। ফলে তিনি ঐ রোগের কবলে পড়েন, যার কোনো চিকিৎসা তখন ছিল না। হাণ্টারকে বাকী জীবন ঐ রোগে ভুগতে হয়েছিল।

তবে সৌভাগ্যবশত ড্যানিয়েলসেন ও তাঁর সহকারীদের কোন ক্ষতি হয়নি এবং এ-ঘটনায় তাঁর মনে স্থির বিশ্বাস হোল, কুষ্ঠরোগ বংশগত ; না হলে তাঁদের মধ্যে কোন একজনের নিশ্চয় রোগ হোত।

ড্যানিয়েলসেন ত্বকের রোগগ্রস্ত অংশ নিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা ক'রে একধরনের জীবাণু দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর এই তথ্য সেদিন কেউ মানতে চায় নি। বিশেষত রোগসৃষ্টিতে জীবাণুর যে কোন ভূমিকা আছে, এই তথ্য তখনও বিতর্কিত।

ড্যানিয়েলসেন নানা ওষুধ ব্যবহার করে কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু ওষুধ ব্যবহার করে চিকিৎসার সব চেষ্টা সেদিন ব্যর্থ হয়। তখন তিনি ব্যবস্থা দিলেন : যাদের রোগ হয়েছে, তাদের সুস্থ মানুষের কাছে থেকে আলাদা রাখতে হবে। তাঁর এই উপদেশ কিন্তু কুষ্ঠরোগ যে বংশানুক্রমিক ধারায় আসে, এই মতবাদের বিরোধী।

ড্যানিয়েলসেনের চেষ্টায় কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে শিক্ষার জন্য সেদিনের নরওয়েতে স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ১৮৯৪ সালে তাঁর কর্মময় জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

এক কারখানার বালক-শ্রমিক, যক্ষ্মারোগ আক্রমণ উপেক্ষা ক'রে নিজেকে হতভাগ্য কুষ্ঠরোগীর সেবায় নিয়োজিত ক'রে, বিশ্বের যে, উপকার করেছেন পৃথিবীর শিক্ষিত মানুষ, অন্তত চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের কাছে তিনি আদর্শ।

হ্যানসেন

যে সময় ড্যানিয়েলসেন চিকিৎসক হলেন তার তিন বছর পরে ১৮৪১ সালে ২৯শে জুলাই নরওয়ে'র বার্জেন শহরেই এক শিশুর জন্ম হয়েছিল। তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল জেরহার্ড হেনরিক আরমার হ্যানসেন। ড্যানিয়েলসেন যে-কাজ আরম্ভ করেছিলেন সেই কাজ আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্যই যেন তাঁর জন্ম। না হলে ঐ বার্জেন শহরেই কেন তাঁর জন্ম, আর পরে ড্যানিয়েলসেনের সঙ্গে তাঁর কেন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ?

১৮৬৬ সালে চিকিৎসক হবার পরে তিনি লুঙ্গেগার্ড হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে যোগ দিলেন ১৮৬৮ সালে। এখানে তিনি কুষ্ঠ রোগীদের বীভৎস চেহারা দেখলেন। তাদের চিকিৎসা দেখে বুঝলেন, রোগীদের চিকিৎসার নামে ধাপ্পা দেওয়া চলছে। আর যে-রোগের কারণটাই অজানা, তার চিকিৎসা হবে কি করে ? রোগীদের ভয়াবহ চেহারা, তাদের অসহায় অবস্থা তাঁকে প্রেরণা দিল, এদের জন্য কিছু তাঁকে করতেই হবে।

নরওয়েতে তখন কুষ্ঠরোগের ফলে বহুলোক অন্ধ হয়ে যেত। এ



হ্যানসেন

এক ভয়াবহ অবস্থা ; একে রোগ-যন্ত্রণা, তার ওপর চোখের সামনে জমাট অন্ধকার। হ্যানসেন প্রথমেই ঠিক করলেন, দেখতে হবে এদের অন্ধত্ব নিবারণ করা সম্ভব কি না। পরে তিনি এই বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ লিখলেন, কুষ্ঠরোগে কিভাবে চোখে ক্ষত সৃষ্টি হয়, আর এই ক্ষত নিবারণ করা সম্ভব কি না।

ইতিমধ্যে প্যাথোলজি বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনার জন্য তিনি জার্মানীর 'বন' বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ পেলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে সে-সময়েও 'বন' বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব খ্যাতি ছিল। হ্যাসনেন এ সুযোগ ছাড়লেন না। ১৮৬৯ সালে অভিজ্ঞতা ও উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি জার্মানী গেলেন। তখন তাঁর বয়েস আঠাশ বছর।

কিন্তু গিয়ে দেখলেন, শহরের আবহাওয়া খুব অশান্ত ; যুদ্ধ চলছে

জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে। স্থির করলেন, এই পরিস্থিতিতে এখানে লেখাপড়া শেখা সম্ভব হবে না। জার্মানী ছেড়ে তিনি অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা গেলেন, যদি সেখানে উচ্চশিক্ষার কোন সুযোগ-সুবিধে পাওয়া যায়। ভিয়েনা তখন চার্লস ডার-উইনের মতবাদে সরগরম। ডারউইন সে-যুগের মানুষের বিশ্বাসে ঘা দিয়েছেন, মরুভূতিতে আঘাত করেছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল মানুষ ঈশ্বর-সৃষ্ট নয় ; কোটি কোটি বছর ধরে বিবর্তনের ফলে মানুষ প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে।

সেকালের ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষ এই মতবাদ মানবে কেন? হ্যানসেন কিন্তু ডারউইনের শিক্ষায় প্রভাবিত হলেন। তাঁর মনে এই বিশ্বাস জন্মালো, কুষ্ঠরোগ ভগবানের অভিশাপ নয়, নিশ্চয়ই কোন জীবাণু এই রোগ সৃষ্টি করে।

কুষ্ঠ.রাগের জীবাণু মা. লেপ্রা

ভিয়েনা থেকে চর্মরোগ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা নিয়ে হ্যানসেন নরওয়েতে ফিরে এলেন। তাঁর মনে তখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে কুষ্ঠরোগ কোন জীবাণু দ্বারা সৃষ্টি হয়। ভিয়েনা যাওয়ার আগে তিনি রোগীদের ক্ষতস্থানের ত্বক বায়োপ্‌সি ক'রে (তন্তুর খুব পাতলা টুকরো নিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখে) হলুদ আভাযুক্ত ছোট লম্বা একজাতীয় জিনিষ দেখেছিলেন। তখন তিনি তার ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। প্রায় একই সময়ে ১৮৬৯ সালে শিলিং নামে আর এক বিজ্ঞানী সন্দেহ প্রকাশ করে ছিলেন, কুষ্ঠ রোগ এই ক্ষুদ্র জীবাণু দ্বারা সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোন প্রমাণ সেদিন তিনি দিতে পারেন নি।

এদিকে ড্যানিয়েলসেন তখনও কুষ্ঠরোগ যে বংশগত এই মতবাদ প্রচার করছেন। হ্যানসেন ড্যানিয়েলসেন-কে গুরু হিসাবে শ্রদ্ধা করলেও তাঁর এই মতবাদ মেনে নিতে পারলেন না। তিনি মনে করলেন, কুষ্ঠ যদি বংশগত রোগ হয় নিশ্চয়ই রোগীর আত্মীয়দের মধ্যে নতুন রোগী বেশী সংখ্যায় পাওয়া যাবে। সেইজন্য কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত লোকদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের আত্মীয়দের খোঁজ খবর নিতে আরম্ভ

করলেন। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন পরিবারের সুস্থলোক রোগীর রোগীর সংস্পর্শ ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র বাস করলে তাদের কুষ্ঠরোগ হয় কি না। নরওয়ে সরকার এই সমীক্ষার জন্য অর্থসাহায্য করেছিলেন। এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হোল, সুস্থ অবস্থায় রোগীর সংস্পর্শ ত্যাগ ক'রে অন্যত্র থাকলে তার রোগ হয় না। কুষ্ঠরোগ যে বংশগত নয়, এই এই গবেষণায় তা প্রমাণিত হোল।

এর মধ্যে ১৮৭৩ সালে ফেব্রুয়ারিতে ড্যানিয়েলসেনে'র মেয়ে স্টেফানি'র সঙ্গে তাঁর বিয়ে হোল।* পাছে শ্বশুর মনে আঘাত পান সেই কারণে ড্যানিয়েলসেনে'র মতবাদের বিরোধিতা করা কঠিন হোল। তিনি ঠিক করলেন, কুষ্ঠরোগের কারণ যে বিশেষ এক শ্রেণীর জীবাণু তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে তিনি বিজ্ঞানীমহলে পেশ করবেন। তার আগে কোন বিতর্কে নিজেকে আর জড়াবেন না।

সুযোগ এলো খুব তাড়াতাড়ি। ১৮৭৩ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি জোহানেস গল নামে এক রোগীর নাকের ভিতরের আস্তরণের ক্ষত-স্থানের তন্তু বায়োপ্‌সি ক'রে তিনি এক ধরনের খুব ছোট অথচ লম্বা ধরনের পদার্থ দেখতে পেলেন। তাঁর বিশ্বাস জন্মালো, এইগুলো নিশ্চয় কুষ্ঠ জীবাণু। কিন্তু দু'একবার পরীক্ষায় সিদ্ধান্ত নেওয়া তো ঠিক নয়। তিনি ৭ই মার্চ ক্রিসটিয়ান লোটাফ নামে আর এক রোগীর ত্বকের ক্ষত বায়োপ্‌সি ক'রে নমুনার মধ্যে প্রচুর সংখ্যায় একই ধরনের জীবাণু দেখলেন। কিন্তু তখনও তিনি স্থিরনিশ্চয় হতে পারছেন না। এই তথ্য বিজ্ঞানীরা না-ও মানতে পারেন।

দু'দিনের মধ্যে আবার সুযোগ এলো। অ্যানি নামে এক গুরুতর অসুস্থ রোগীর তখন চিকিৎসা চলছিল। তার ত্বকে বয়োপ্‌সি করে প্রচুর জীবাণু পাওয়া গেল। ১০ ই মার্চ মেয়েটি মারা গেল। ১১ মার্চ তিনি তার শব ব্যবচ্ছেদ করলেন। দেখতে পেলেন, শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রে প্রচুর সংখ্যায় একই ধরনের জীবাণু রয়েছে। এই সব জীবাণু যে

* স্টেফানি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন এবং বিয়ের সাত মাস পরে মারা যান।

কুষ্ঠরোগ সৃষ্টি করে তাতে তখন আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। হ্যানসেন এই জীবাণুর নাম দিলেন—মাইকোব্যাকটেরিয়াল লেপ্রা।

এই আবিষ্কারের পরেও কিন্তু হ্যানসেন বিজ্ঞানীদের সামনে তা প্রকাশ করেন নি। ভয় ছিল, তাঁর অল্প বয়েস, এদিকে শ্বশুর ড্যানিয়েলসেনের দেশ-বিদেশ এত নাম-ডাক ; তাঁর মতবাদ বিজ্ঞানীরা না-ও মানতে পারেন।

কিন্তু ঠিক এ-সময়ে হ্যানসেনের মতোই বক্তব্য অন্য দেশের বিজ্ঞানীর মুখ থেকে শোনা গেল। ভারতের সেনা-বিভাগের এক সার্জেন, মেজর কার্টার-এর সঙ্গে হ্যানসেনের পরিচয় হোল। কুষ্ঠরোগ ভারতেও এক গুরুতর সমস্যা। মেজর কার্টার নিজেও আগ্রহী ছিলেন রোগের কারণ জানতে। হ্যানসেন মেজর-কে তাঁর গবেষণার পদ্ধতি দেখালেন। মেজর কার্টার হ্যানসেনের কর্মধারায় প্রভাবিত হলেন। শুধু তাই নয়, পরের বছর ১৮৭৪ সালে সরকারী 'শ্বেত পত্রে' হ্যানসেনের গবেষণা-লব্ধ ফল তিনি প্রকাশ করলেন। হ্যানসেনের কাজ বিদেশীর কাছেও স্বীকৃতি পেল।

অবশ্য হ্যানসেন নিজেও ইতিমধ্যে নরওয়ে'র চিকিৎসা-বিজ্ঞান পত্রিকায় তাঁর গবেষণা পদ্ধতি ও কি ফল পাওয়া গিয়াছে, তা প্রকাশ করলেন। দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীমহলে সাড়া পড়ে গেল। কারণ এর আগে কেউ তো আর প্রমাণ করতে পারেন নি যে জীবাণু ঐ রোগ সৃষ্টি করতে পারে, যদিও অনেক সন্দেহ করেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ মাতৃভাষা ছাড়া ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষাতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হোল।

১৮৮১ সালে লুঙ্গেগার্ড হাসপাতালের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হলেন হ্যানসেন। সরকারকে তিনি বোঝালেন, রোগীদের বাড়ী থেকে সরিয়ে এনে হাসপাতালে রাখলে নতুন রোগীর সংখ্যা কমতে থাকবে। সরকার তাঁর উপদেশ মেনে নিয়ে নতুন আইন তৈরী করলেন, যার ফলে কুষ্ঠ-রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া বাধ্যতামূলক করা হোল। আইন

অনুযায়ী রোগীদের ভর্তি করতে গিয়ে দেখা গেল, শয্যা-সংখ্যা রোগীর তুলনায় কম। সঙ্গে সঙ্গে নতুন হাসপাতাল হোল। রোগী খুঁজে হাসপাতালে আনা হোল। উদ্দেশ্য, কোনো রোগী তার পরিবারের মধ্যে নতুন রোগী সৃষ্টি করতে না পারে। (তখন কোন ওষুধ ছিল না, সুতরাং সংক্রমণ রোধ করার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল। এখন অবশ্য কুষ্ঠরোগ চিকিৎসার জন্য অনেক ভাল ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে যার ফলে চিকিৎসা ক'রে আজ কুষ্ঠরোগ সারানো সম্ভব।)

কয়েক বছরের মধ্যে এই সঠিক পদক্ষেপের সুফল পাওয়া গেল। অনেক রোগী মারা গেল বটে, কিন্তু তাদের আত্মীয়দের নতুন ক'রে রোগ হোল না। ফলে রোগীর সংখ্যা কমতে আরম্ভ করল। শেষে উনবিংশ শতকের শেষ দিকে দেখা গেল, হাসপাতালে বহু শয্যা রোগীর অভাবে খালি আছে। কয়েকটি ওয়ার্ড বন্ধ করে দিতে হোল। মোলডে শহরের একটি বড় কুষ্ঠরোগ হাসপাতালে যক্ষ্মারোগীদের জন্য স্যানাটেরিয়াম হোল।

১৮৯৪ সালে ড্যানিয়েলসেনের মৃত্যুর পরে হ্যানসেন বার্জেন মিউজিয়ামে অধ্যক্ষ হলেন। ১৯০৯ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কুষ্ঠ কংগ্রেসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞ-বিজ্ঞানীরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বার্জেন শহরে সমবেত হ'য়ে কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সেই অধিবেশনে সকলে একমত হন যে কুষ্ঠরোগ আছে সেখানে এই পদ্ধতি প্রচলন করা উচিত।

হ্যানসেনের পদ্ধতি যে সঠিক ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এক ছোট্ট খতিয়ানে। ১৮৫৬ সালে নরওয়েতে কুষ্ঠরোগী ছিল তিন হাজার; আর ১৯৫২ সালে নরওয়ে-সুইডেনে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা মাত্র এগারো।

কর্মযোগী হ্যানসেনের বয়স বৃদ্ধি পেলেও তাঁর কর্মক্ষমতা কমে নি,

৭১ বছর বয়সে তিনি যখন নরওয়ের পশ্চিম উপকূলে সফর করছিলেন, সেই সময় ১১ই ফেব্রুয়ারি সারাদিন পরিভ্রমণের পরে রাতে তিনি ঘুমোতে যান—অপরদিন সকালে বিছানায় দেখা গেল তাঁর প্রাণহীন দেহ।

এইভাবে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি নিজেকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত রেখেছিলেন।

ভিটামিন

ইজিকম্যান : কাসিমির ফ্যাঙ্ক : গোল্ডবার্জার

পনের শতকে ইউরোপে ধর্মযুদ্ধ লাগল। নানা দেশ থেকে সৈন্যরা ইউরোপে আসতে লাগল; কেউ ঘোড়ায় চড়ে, কেউ পায়ে হেঁটে, আবার কেউ হয়ত জাহাজ চড়ে।

অনেকে এল, আবার অনেকে পৌঁছোতে পারল না। কারণ তাদের মাড়ি ফুলে উঠেছে, দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ছে। অনেকে ফিরে গেল। কেউ কেউ মরে গেল।

ভাস্কো-ডা-গামা সমুদ্র যাত্রা করলেন। বহু নাবিক একই রোগে মারা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এমন হোত যে জাহাজ নিয়ে দেশে ফিরে আসার নাবিক পাওয়া যেত না।

তখনকার সমুদ্র যাত্রা তো এখনকার মত ছিল না। একটানা কয়েক সপ্তাহ ধরে জাহাজ চলত।

এই ঘটনা সেকালে সকলের চোখে পড়েছিল, কিন্তু কারণটা কেউ জানত না।

সতের শতকে কমোডর ল্যাংকাস্টার জানালেন লেবু, খেলে এই রোগ হবে না। পরে, এখন থেকে প্রায় তু'শ বছর আগে তাঁর সমুদ্র যাত্রায় নাবিকদের জন্য টাটকা শাক-সব্জীর ব্যবস্থা করেছিলেন। সে যাত্রায় তাঁর নাবিকদের স্কারভি হয়নি। বোঝা গেল টাটকা সব্জী বা লেবুর অভাবে এক বিশেষ ধরনের রোগ হয়। তবে সেই সব্জীর কোন উপাদান আমাদের রোগ থেকে রক্ষা করে তা অজানা থেকে গেল।

*　　*　　*

গত শতকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ওলন্দাজ সৈন্যদের এক ধরনের

রোগ হতে দেখা গেল। যার নাম বেরি বেরি। পা ফোলে, একটু হার্টের দুর্বলতা যা অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ডাঃ সরকার এক তরুণ ডাক্তারকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পাঠালেন। যা আজ ইন্দোনেশিয়া নামে পরিচিত। সেদিন পর্যন্ত এটি ছিল ডাচ কলোনী ডাক্তারটির নাম ক্রিশ্চিয়ান ইজিকম্যান। তিনি ১৮৯১ সালে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গেলেন ডাচ সৈন্যদের বেরিবেরি রোগের কারণ খুঁজতে। আর সম্ভব হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে।

ডাক্তার ইজিকম্যান নানা জায়গায় ঘোরেন, রোগী দেখা শোনা করেন, কিন্তু কোন কারণ খুঁজে পান না একদিন বাংলোর সামনে লনে বসে আছেন, সামনে কতকগুলো মুরগী। রোজই এমন ছাখেন। কিন্তু মাটি থেকে কি খুঁটে খাচ্চে না, কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। কয়েক সপ্তাহ ওদের দানা নেই, তাই ওরা চাল খাচ্ছে। সেই চাল যা সৈন্যদের খাওয়ান হচ্ছে।

মনে প্রশ্ন এলো, আচ্ছা এই চালের জন্যে বেরিবেরি হচ্ছে কি? সৈন্যদের যে চাল খাওয়ানো হয় তা মেশিনে ছাঁটা, ধবধবে সাদা।

কাউকে কিছু বললেন না। সাধারণ মানুষ, গরীবরা ব্যবহার করত ঢেঁকি ছাঁটা চাল। তিনি মুরগীদের ঢেঁকি ছাঁটা লাল মোটা চাল খেতে দিলেন। দু'দিনেই তারা সুস্থ হয়ে উঠলো। ডাঃ ইজিকম্যান বুঝলেন ঐ লাল খোসায় এমন জিনিস আছে যা আমাদের বেরিবেরি হতে দেয় না। তিনি তখন মোটা লাল চাল এলকোহলে রেখে জলে ধুয়ে, সেই চাল ধোঁয়া জল রোগীদের খেতে দিলেন এবং তারা সুস্থ হয়ে উঠল।

তিনি সরকার ও ডাক্তারদের তাঁর কথা বোঝাতে চেষ্টা করলেন কিন্তু কেউ তাঁর কথা শুনতে চায় না উল্টে তারা বলল, অর্থব্যয় আর পণ্ডশ্রম না করে ফিরে যাও।

ইজিকম্যান কর্তাদের দরজায় দরজায় ঘুরতে লাগলেন। একজন

তাঁর কথা মন দিয়ে শুনলেন, তারপরে ইজিকম্যানকে বললেন, 'তোমার এ সিদ্ধান্তের প্রমাণ দিতে পার ?'

প্রমাণ পাওয়া গেল জেল খানাতে। সারা দেশে তখন প্রায় আড়াই লাখ কয়েদী। তাদের মধ্যে দেড় লাখের বরাদ্দ ছিল, মেশিন ছাটা চাল। এদের মধ্যে চারশ জন বেরিবেরিতে ভুগছে, আর বাকী লাখ খানেক কয়েদী খায় ঢেঁকি ছাটা লাল মোটা চাল। তাদের বেরিবেরি দেখা গেল মাত্র ন' জনের।

এতেও সরকারী কর্তারা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তখন ঐ লাল চাল ফুটিয়ে তার ফ্যান ফেলে না দিয়ে রুগ্ন কয়েদীদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা হল, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তারা সেরে উঠল।

এর পরে সকলের বিশ্বাস হল চালের লাল খোসাতে এমন কোন জিনিস আছে, যা আমাদের শরীরের জন্য খুব দরকার। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। কেউ ল্যাবরেটারীতে বসে ঐ লাল জিনিষটা কি তা জানবার চেষ্টা করেন নি।

শেষ পর্যন্ত ১৯১২ সালে ডাঃ কাসিমির ফ্যাংক ইংল্যাণ্ডের লিষ্টার ল্যাবরেটারীতে গবেষণা করে বললেন, এটা এক প্রকার 'এমাইল', যা আমাদের জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য। তিনি এই বিশেষ জিনিসটার নাম দিলেন 'ভিটামিন'। লাতিন ভাষায় 'ভিটা' কথাটির মানে হোল প্রাণ এবং এমাইন, যা বেরিবেরি রোগের লক্ষণ দূর করতে পেরেছিল।

ডাঃ কাসিমির ফ্যাংক এর জন্ম পোলাণ্ডে। লেখাপড়া শিখে ছিলেন নিজের দেশে। পোলাণ্ডে তখন 'জার' এর শাসন। দেশের লোকের কোন স্বাধীনতা নেই। ডাঃ ফ্যাংক দেশ ছেড়ে এলেন লণ্ডনে। টাকা রোজকারের উদ্দেশ্য নিয়ে দেশ ছাড়েন নি, গবেষণা করার সুযোগ পাওয়ার জন্যে দেশ ছেড়েছিলেন।

সুযোগ পেয়েও গেলেন তিনি ইংল্যাণ্ডে লিষ্টার ইনস্টিটিউটে

গবেষণার সুযোগ পেলেন। সেখানে তিনি চালের উপরের লাল খোসা আলাদা করে রোগীকে খাইয়ে বেরিবেরি রোগ সারাতে পেরেছিলেন।

ইজিকম্যান ও ফ্যাংক এর গবেষণার খবরে উৎসাহিত হয়ে বিশ্বের নানা দেশের গবেষকরা ভিটামিন নিয়ে গবেষণা করতে এগিয়ে এলেন। ভাল খাবারের অভাবে যে নানা রকম রোগ হয় তা জানা ছিল; এখন বোঝা গেল শুধু খাবারের মান বা পরিমাণ নয়, খাবারে ভিটামিনের অভাব থাকলে নানা রকম রোগ হতে পারে।

বহু বছর আগে হিপোক্রেটিস বলেছিলেন, রাতকানা রোগ খাবারের অভাবে হতে পারে। যাদের হয়েছে, তাদের ষাঁড়ের লিভার ও মধু খাওয়ালে তারা দৃষ্টি ফিরে পাবে। সেই সূত্র নিয়ে আমেরিকার উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ এলমার ম্যাককোলাম খুঁজতে লাগলেন স্নেহ জাতীয় খাবারে কোন ভিটামিন আছে কি না? আর যদি থাকে তার প্রকৃতি কি?

দেখা গেল, দুধ, মাখন ও ডিমের মধ্যে এমন এক ভিটামিন আছে যা অন্ধত্ব নিবারণে সাহায্য করতে পারে। ডাঃ ম্যাককোলাম এই বিশেষ ভিটামিনের নাম দিলেন ভিটামিন—'এ'। এই ভিটামিনের অভাব হলে অক্ষিগোলকের উপরের পর্দা খসখসে হয়ে চোখে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হয়। শরীরের চামড়া নানা জায়গায় ছোট কাঁটার মত দেখায়। চলতি ভাষায় অনেকে একে পদ্ম কাঁটা বলে।

প্রায় একই সঙ্গে ইউরোপের বিজ্ঞানীরা জানালেন তাঁরা কড মাছের লিভার থেকে এক প্রকার তেল পেয়েছেন। তাঁরা জানালেন এই তেলে ভিটামিন 'এ' ছাড়া আর এক প্রকার ভিটামিন আছে, যার নাম ভিটামিন 'ডি'।

এই 'ডি'-ভিটামিনের অভাব হলে শিশুদের হাড় খুব দুর্বল হয়, বেঁকে যায়। রিকেট নামে হাড়ের রোগ হতে পারে খুব ছোট বয়সে। গর্ভবতী নারী বা নবজাতকের মা এই ভিটামিনের অভাবে হাড়ের

গুরুতর অসুখে ভুগতে পারে। কোমরে ব্যথা, খুঁড়িয়ে চলতে দেখা যায় এই রোগীদের।

ভিটামিন আবিষ্কারের খবর পেয়ে সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞানীরা দারুণ উৎসাহে নতুন নতুন ভিটামিন সন্ধান করতে লাগলেন। ১৯২০ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ আলফ্রেড হেসে'র নেতৃত্বে ও উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ হ্যারি স্টাইনবেকে'র নেতৃত্বে হু'দল বিজ্ঞানী তেল ও খাবারে অতিবেগুনি রশ্মি প্রয়োগ করে পরীক্ষা করেছিলেন। ডাঃ স্টাইনবেক রশ্মি প্রয়োগ করলেন চর্বি আর অলিভ তেলে। আর ডাঃ হেস তিসি ও কার্পাস তেলে। এর পর পরীক্ষায় দেখা গেল ঐ তেলে ভিটামিন 'ডি' তৈরী হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় সূর্যের আলোয় যে অতি-বেগুনি রশ্মি আছে তার প্রভাবে গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মানুষের শরীরে চামড়ার ঠিক নীচের স্তরে ৭-ডি হাইড্রোকেলেষ্টেরল থেকে ভিটামিন 'ডি' সৃষ্টি হয় এবং চামড়ার নীচে রক্তবাহী শিরার মাধ্যমে রক্ত প্রবাহে মিশে যায়।

ভিটামিন 'ডি' লিভার, ডিমের কুসুম এবং দুধের মধ্যেও ভাল পরিমাণে থাকে, যেহেতু সূর্যের আলোর প্রভাবে ভিটামিন 'ডি' সৃষ্টি হয়, সেই জন্য যে দেশে সূর্যের আলো বেশী সে দেশে ভিটামিন 'ডি'র অভাব খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তবে অভাব হতে পারে নবজাত শিশু ও তাদের মা'দের ক্ষেত্রে, যদি তারা পুষ্টিকর খাবার না পায় এবং সূর্যের আলোয় আনার সুযোগ না থাকে। অবশ্য এই সব তথ্য জানা গিয়েছে অনেক পরে।

বিভিন্ন তেল ও খাবারে অতি বেগুনি রশ্মি প্রয়োগের অভিজ্ঞতা হু'জন বিজ্ঞানী প্রকাশ করলেন। তবে ডাঃ স্টাইনবেক এই তথ্য তাড়াতাড়ি মেডিকেল জার্নালে প্রকাশের জন্য জমা দেওয়ায় আবিষ্কারের কৃতিত্বটা তাঁর দলই পেলেন। আর ডাঃ হেস এক চিকিৎসক সম্মেলনে এই তথ্য প্রকাশ করলেন কয়েক সপ্তাহ পরে।

এই ভাবে সারা বিশ্বে নিত্য নতুন ভিটামিন আবিষ্কারের প্রতি-যোগীতা চলছে, তখনও কিন্তু ডাঃ ইজিকম্যান ও ডাঃ ফাংকের সেই চালের উপরের লাল রং' এর খোসাটিতে কি আছে তা কেউ বুঝতে পারেন নি। খোসার উপকারীতা আবিষ্কারের প্রায় সতের বছর পরে ১৯২৯ সালে রসায়ন বিজ্ঞানীরা সেই চালের খোসাকে বিশ্লেষণ করেন, আর তার নাম দিলেন ভিটামিন 'বি, যদিও এই ভিটামিন সর্বপ্রথমে আবিষ্কার হয়েছিল।

আরও পরে জানা গিয়েছিল এই 'বি' ভিটামিনের মধ্যে একরকম নয়, আরও কয়েক রকম জীবন রক্ষার সম্পদ রয়েছে—যার অভাবে নানা রকম রোগ হতে পারে। 'বি' ভিটামিনের যে অংশটি বেরিবেরি রোগ প্রতিরোধ করে তার নাম দেওয়া হোল বি—১, রাসায়নিক নাম থিয়ামিন হাইড্রোক্লোরাইড। অপর অংশগুলি হোল রিবোফ্লোভিন, যার অভাবে জিভে ঘা, ঠোঁটের কোনে ঘা হবে। অন্য এক অংশ নিকোটিনিক অ্যাসিড বা নিকেটিনামাইড। এই ভিটামিনের অভাবে পেলাগ্রা নামে এক ধরনের মারাত্মক রোগ হয়। এই সব তথ্য অবশ্য আগে জানা ছিল না—জানা গিয়েছে, অনেক পরে।

পেলেগ্রা রোগকে বলা হোত গরীব মানুষের রোগ। কারণ গরীবদের মধ্যেই এই রোগ বেশী দেখা যেত। রোগীর গায়ে লাল ফোসকা হোত, যা পরে ফেটে গিয়ে ঘা হোত। রোগের কারণ কেউ জানত না। সন্দেহ করা হত কোন জীবাণু দ্বারা এই রোগ হয়।

১৯১৫ সালে ডাঃ গোল্ডবার্জারকে এই রোগের কারণ আর চিকিৎসার উপায় খুঁজে বার করতে নির্দেশ দিলেন আমেরিকার পাবলিক হেলথ বিভাগ।

যোগ্য লোককেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কারণ দারিদ্র যে কি, তা গোল্ডবার্জার হাড়ে হাড়ে জানতেন। বাবা ছিলেন চেকো-স্লোভকিয়ার এক গরীব ভাগচাষী। প্রাণান্ত পরিশ্রম করেও রোজ। দু'বেলা খাওয়া জুটতো না শেষে দেশ ছেড়ে পালালেন আমেরিকায়।



ডেভিড গোল্ডবার্জার

তখন গোল্ডবার্জারের বয়েস মাত্র সাত বছর। সে দেশে গিয়ে নিউইয়র্কের কাছে এক বস্তির মধ্যে মুদিখানা দোকান করলেন তার বাবা। ছোট গোল্ডবার্জার বাবার কথা মত জিনিষ নিয়ে খদ্দেরদের বাড়ী বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসে।

কিন্তু লেখাপড়ায় তার ভীষণ ঝোঁক। অবসরের সময়টুকু সে নষ্ট করতে চায় না। সুযোগ পেলেই বই নিয়ে বসে। ছেলের পড়ায় আগ্রহ দেখে বাবা তাকে দোকান থেকে সরিয়ে স্কুলে পাঠালেন। একের পর এর এক বাধা পার হয়ে পঁচিশ বছর বয়সে ডাক্তার হয়ে আমেরিকার মেরিন হাসপাতালে চাকরি নিলেন। ১৯১৪ সালে হাসপাতাল তরুণ ডাঃ গোল্ডবার্জার'কে পেলাগ্রার কারণ খুঁজতে

পাঠালো, সঙ্গে আরও একচল্লিশ জন সহকারী। হাজারে হাজারে লোক মরছে, ল্যাবরেটরীতে গবেষণা করে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দেখা যাক ঐ কৃতি তরুণ ডাক্তার রোগের কারণ বা তার প্রতিকার জানাতে পারে কি না।

ঐ বছরেই মিসিসিপি শহরে ভীষণ ভাবে পেলাগ্রা দেখা দিল। অনাথ আশ্রমে রোজ শিশুরা মারা যাচ্ছে। গোল্ডবার্জার একটি অনাথ আশ্রমে গিয়ে দেখলেন, ২১১ জনের মধ্যে ১৮৬ জনের পেলাগ্রা। কেন? এই কেন'র উত্তর জানতে খাবার ঘরে গেলেন তিনি, দেখা যাক এরা কি খায়। তখন সবে ভিটামিন আবিষ্কার হয়েছে।

ডাঃ গোল্ডবার্জার দেখলেন, বয়েস হিসাবে ছেলেদের দুভাগে রাখা হয়েছে। বেশী বয়সের ছেলেদের পরিশ্রম করতে হোত, তারা খেতেও পেত বেশী। আর পেত একটু দুধ, মাংস, ডিম, মাখন। কম বয়সীরা পেত বিস্কুট, ভাত, ঝোলা গুড়, কফি আর আলুসেদ্ধ। আর এরাই ছিল পেলাগ্রা'র শিকার।

ডাঃ গোল্ডবার্জারের সিদ্ধান্ত হোল খাবারে কিছু একটা অভাবের জন্য নিশ্চয়ই এই রোগ হচ্ছে। একটু দুধ, ডিম, মাংস খেতে দিলেই রোগ সেরে যাবে।

কিন্তু তার কথা কেউ মানতে চায় না। একে তো তাঁর কম বয়েস, তার ওপর কর্তাদের মাথায় বদ্ধমূল ধারণা ছিল, এই রোগ হয় জীবাণু দ্বারা।

গোল্ডবার্জার কিন্তু থামলেন না। মিসিসিপি'র ঐ অনাথ আশ্রমে সব শিশুকে মাংস, ডিম, দুধের ব্যবস্থা করলেন। বছর ঘুরে ১৯১৫ সাল এলো। ঐ বছর মিসিসিপি শহরে ১৫৩৫ জন পেলাগ্রা'তে মারা গেল, কিন্তু অনাথ আশ্রমে একজনও মরল না যেখানে প্রতি বছর শতাধিক শিশু মারা যেত।

কিন্তু তবুও লোক বিশ্বাস করতে রাজী নয়। গোল্ডবার্জার কিন্তু হাল ছাড়লেন না। মিসিসিপি জেলে কয়েদীরা ভাল খাবার পেত।

বুঝিয়ে সুঝিয়ে এগারোজন কয়েদীকে নিচুমানের খাবার খেতে রাজী করালেন। তাদের মধ্যে ছ'জনের পেলাগ্রা হতে দেখা গেল।

তবুও কর্তারা বিশ্বাস করতে চায় না। বড় বড় ডাক্তাররা যেখানে বলছেন এই রোগ হয় জীবাণু দ্বারা, সেখানে সেদিনের পাশ করা ছোকরা ডাক্তার অন্য কথা তাঁরা মানবেন কেন?

তখন গোল্ডবার্জার আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি রোগীর রক্ত নিজের শরীরে ইনজেকশন নিলেন। কিছু হোল না। তারপরে রোগীর ক্ষতের খোসা দিয়ে পিল তৈরী করে নিজেরা খেলেন। কারও পেলাগ্রা খেলেন। এত সব করা সত্বেও অবিশ্বাসীদের মনের সন্দেহ ঘুচল না।

এর পরে গোলড্‌বারজার তাঁর স্ত্রী মেরী'কে পেলাগ্রা রোগীর রক্ত ইনজেকশন দিলেন। তারও কিছু হোল না।

খবর আর চাপা থাকল না। খবরের কাগজও বেশ ফলাও করে লিখল একথা। তখন লোকদের কিছুটা বিশ্বাস হোল যে ভাল খাবার দিতে পারলে বোধ হয় পেলাগ্রা রোগ হবে না। এত চেষ্টার পরে চাষীর ডাক্তার ছেলের পরিশ্রম সার্থক হোল। পরে গবেষণা করে জানা গেল ভিটামিন 'বি'র এক উপাদান নিকোটিনিক অ্যাসিডের অভাবে পেলাগ্রা হয়।

* * *

ভিটামিন বি-কমপ্লেকস তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আলাদা করার পরেও কিছু থেকে গেল। আমেরিকার বোসটন শহরের ডাঃ জর্জ মিনোট সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগলেন। সেই অজানা জিনিষটা কি হতে পারে? তাঁর চোখে পড়েছিল কয়েক ধরনের রক্তাল্পতা রোগে গরু-ভেড়ার লিভার বা মাছের তেল খাওয়ালে রোগী খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে। তিনি বুঝলেন যকৃতে বা মাছের তেলে এমন কোন অজানা জিনিষ আছে যা রোগীর হাড়ের ভিতরে মজ্জায় লোহিত কণিকা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

ডাঃ মিনেটের এই পরীক্ষার খবর চাপা রইল না। অন্য বিজ্ঞানীরা যকৃতে'র নির্যাস তৈরী করে রোগীদের ইনজেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

বহুবছর ধরে এই পদ্ধতিতে রক্তাল্পতা রোগের চিকিৎসা করা হয়েছিল। শেষে গত বিশ্বযুদ্ধের সময় টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ উইলিয়াম ও তাঁর সহযোগীরা লক্ষ করলেন স্পিনাক পাতায় এমন জিনিষ আছে যা লিভারের মত রক্তাল্পতা রোগে ভালই কাজ দেয়। যেহেতু এই ভিটামিন স্পিনাক শাকের পাতায় পাওয়া গেল তাই নাম দেওয়া হোল 'ফলিক অ্যাসিড'; কারণ পাতার বৈজ্ঞানিক নাম ফলিয়েজ। পরে জানা গেল লিভার ও স্পিনাক ছাড়া ফলিক অ্যাসিড শিম, কয়েক জাতের ছত্রাক ও ঈষ্টের মধ্যে পাওয়া যায়।

এর পরে ল্যাবরেটারীতে কৃত্রিমভাবে ফলিক অ্যাসিড তৈরীর চেষ্টা চলতে থাকল। অনেক চেষ্টায় যদিও বা ফলিক অ্যাসিড তৈরী করা সম্ভব হল কিন্তু রোগীর ওপর ব্যবহার করে কোন ফল হল না। নিশ্চয়ই ফলিক অ্যাসিড তৈরী করার প্রক্রিয়ায় কোন অংশ বাদ পড়েছে বা নষ্ট হয়েছে।

তখন আমেরিকার লেডারলে ল্যাবরেটারী এগিয়ে এলেন; তাঁরা একবার চেষ্টা করে দেখতে চান।

সম্মতি পাওয়া গেল। ডাঃ সুব্বা রাও'এর নেতৃত্বে ষোলজন গবেষক ল্যাবরেটারীতে ভিটামিন 'বি'র সংশ্লেষণ আরম্ভ করলেন। কোম্পানি কয়েক হাজার ডলার দিয়ে বললেন, খরচের জন্যে ভেব না —গবেষণা করে যাও।

ভিটামিন 'বি বিশ্লেষণ করা হল। লেডারলে বিজ্ঞানী দল খুঁজতে লাগলেন আর কোথায় ফলিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গায় খুঁজতে লাগলেন। শেষে প্রজাপতির পাখার হলুদ রঙ'এ অ্যাসিড।

সেই রং বিশ্লেষণ করার পরে ল্যাবরেটারীতে কৃত্রিম উপায়ে ফলিক

অ্যাসিড তৈরী করা সম্ভব হল। হাসপাতালে যে সব রোগীরা রক্তাল্পতায় ভুলছিল তাদের ওপর কৃত্রিম উপায়ে তৈরী ফলিক অ্যাসিড ব্যবহার করে আশাতীত ভাল ফল পাওয়া গেল।

ইতিমধ্যে আরও ভিটামিন অবিষ্কার হয়েছে—আরও গবেষণা চলেছে। লেবুর মধ্যে ভিটামিন 'সি' অনেক আগেই আবিষ্কার হয়েছে। ১৯২৮ সালে জেণ্ট-গিওরগি কিডনির উপর দিকে সুপ্রারেনাল করটেকস এই ভিটামিন পৃথক করতে পেরেছিলেন। তবে ভিটামিন 'সি'র অভাব মানুষ ও গিনিপিগ ছাড়া আর কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। জেণ্ট-গিওরগি টম্যাটো ও শাক সবজীর মধ্যে এই ভিটামিনের সন্ধান পেয়েছিলেন। লেবুর মধ্যে যে এই ভিটামিন আছে অনেক বছর আগে থেকেই জানা ছিল। পরে ১৯৪০ সালে ক্রানডন শাক শবজী না খেয়ে ভিটামিনের অভাব সৃষ্টি করে নিজের ওপর স্কার্ভি রোগ সৃষ্টি করেছিলেন।

ভিটামিন 'ই' আবিষ্কার হোল। এটিও অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন; শরীর রক্ষার জন্য তো বটেই, প্রজাতির বংশ রক্ষার জন্য এটি অপরিহার্য।

১৯২২ সালে ইভান্স ও বিশপ এবং পরের বছর সিওর দেখালেন এই ভিটামিন পাওয়া যায় লেটুস, আলফা ও কড়লিভার তেলে। ১৯৩৬ সালে ইভানস হুইটজার্ম তেল, তুলো বীজের তেল থেকে এই ভিটামিন পৃথক করতে পেরেছিলেন। ১৯৩৮ সালে বার্জ, টড, স্মিথ প্রত্যেকে আলাদা ভাবে বিটা-টকোফেরল থেকে এই ভিটামিন কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করতে পেরেছিলেন।

যখন ভিটামিনের কথা কেউ ভাবেনি সেই সময় ১৮৯০ সালে পাম লক্ষ্য করেছিলেন সূর্যের আলোর অভাবে হাড়ে এক প্রকার রোগ হয়। প্রমাণ হিসেবে ১৯১৮ সালে মেলানবি কুকুর ছানাদের কৃত্রিম ভাবে ভিটামিনের অভাব ঘটিয়ে রিকেট সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তখন ভিটামিন নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে তোলপাড় চলছে। এর ঠিক

পরের বছরেই হ্যারিয়েট চিক এবং হালডাসচিনসকি আলাদা ল্যাবরেটারী গবেষণা করে প্রমাণ করলেন কডলিভার তেল, সূর্যের আলো ভিটামিন 'ডি'র অভাব ঘটতে দেয় না এবং রিকেট প্রতিরোধ করতে পারে।

এই শতকের আরম্ভ থেকে মধ্য পর্ব পর্যন্ত অনেক ভিটামিন আবিষ্কার হল। পরে দেখা গেল এই ভিটামিনের অপব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। সাধারণ মানুষের মনে হল, যেহেতু ভিটামিন খাদ্যপ্রাণ— সুতরাং এটি খেলে শরীরে শক্ত হবে, তাজা থাকবে, আর অসুখ বিসুখ হবে কম।

কিন্তু এই ধারণা মারাত্মক ভুল, যে ভিটামিন জলে দ্রব হয়, যেমন ভিটামিন 'বি' ও 'সি', তা বেশী খেলেও শরীরে ভাল না হলেও, ক্ষতি হবে না। কারণ তা শরীরে জমে থাকবে না, প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

তবে ভিটামিন 'এ', 'ডি', 'ই' ও 'কে' প্রভৃতি যেগুলি তেলে দ্রব সেগুলি থেকে সহজে বেরিয়ে যায় না। শরীরে জমে থাকে। ফলে পরে নানা রকম মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

তবুও অজ্ঞ মানুষ স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে ভিটামিন খেয়ে চলেছে, নিজের শরীরের ক্ষতি করছে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য থেকে ভিটামিন সৃষ্টির উপাদান পেয়ে থাকি। বিনা দরকারে ভিটামিন খাওয়া হলে শরীরের নিজস্ব ভিটামিন সৃষ্টি ব্যাহত হয়। সুতরাং যাদের ভিটামিন কিনে খাওয়ার আর্থিক সঙ্গতি আছে, তাদের জানা উচিত, দরকার নাহলে ভিটামিন খাওয়া ঠিক নয়। অপ্রয়োজনে ভিটামিন খেয়ে তারা জাতীয় সম্পদ নষ্ট করছেন, যাদের সত্যই ভিটামিনের অভাব তাদের বঞ্চিত করছেন। ভিটামিন তাদেরই দরকার যারা গরীব, পুষ্টিকর খাবার পায় না, নানা রকম রোগে ভোগে; আর থাকে বস্তিতে বা ফুট পাথে।

ডঃ সুব্বা রাও

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। দক্ষিণভারতে মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজের রেজিষ্টারের ঘরে প্রবেশ করল এক যুবক। তাঁর কাছে সে প্রকাশ করল মনের বাসনা। ছেলেটি ডাক্তারী পড়ার জন্য মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে চায়। সে তখন বি. এস-সি পড়ছে।

'তুমি তো বিজ্ঞান পড়ছো, তোমার হঠাৎ ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছে হোল কেন?'

কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রে ছেলেটি উত্তর দিলো, 'আমি 'স্প্রু' (Sprue) রোগের ওষুধ আবিষ্কার করতে চাই।'

রেজিষ্টার জোরে হেসে উঠলেন। ছেলেটি এমন এক রোগের ওষুধ আবিষ্কার করতে চায়, যার কারণ ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাছেও অজানা।

কিন্তু ছেলেটির মুখে তিনি কি দেখেছিলেন জানা নেই, তার কথায় প্রভাবান্বিত হয়ে তাকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে নিলেন। সে-সময়ে ডাক্তারী পড়ার কলেজে ভর্তি হতে এত বাধানিষেধ ছিল না। ছাত্র প্রশ্নের ঠিকমত উত্তর দিয়ে কর্তৃপক্ষকে খুশী করতে পারলে তাকে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হবার সুযোগ দেওয়া হোত।

যে ছেলেটিকে সেদিন মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হোল, তার নাম ইয়েলাপ্রাগডা সুব্বা রাও। মাদ্রাজের কলেজে বিজ্ঞান পড়ছিল। চোখের সামনে ধীরে ধীরে মরে যেতে দেখল তার ছোট ভাইকে। রোগে তার রং হয়েছে ফ্যাকাসে, জিভ ফুলে উঠেছে, পাতলা পায়খানা হচ্ছে। রোগের নাম নাকি 'স্প্রু'। যে চিকিৎসক তার ভাই-এর চিকিৎসা করছিলেন, তিনি খোলাখুলি স্বীকার করলেন,



ডঃ সুব্বা রাও

এ রোগের চিকিৎসা তো নেই-ই, এমনকি রোগের কারণটিও কেউ জানে না।

খুব অবাক হলেন সুব্‌বা রাও; রোগের কারণই যখন অজানা, তখন মিথ্যে চিকিৎসার ভড়ং ক'রে কী লাভ? সেদিন তরুণ সুব্‌বা রাও কঠিন শপথ নিলেন, তাঁকে ডাক্তার হতে হবে এবং 'স্প্রু' রোগ নিরাময় করতে পারে এমন ওষুধ খুঁজে বার করতে হবে। সেইজন্য তিনি সেদিন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার জন্য আবেদন রেখেছিলেন রেজিস্ট্রারের কাছে এবং আমাদের অশেষ সৌভাগ্য যে সেদিন সেই অফিসার সরকারী আইন-কানুনের দোহাই দিয়ে সুব্‌বা রাও-এর আবেদন প্রত্যাখান করেন নি।

ইয়েলাপ্রাগডা সুব্‌বা রাও'এর জন্ম ১৮৯৬ সালে জুলাই মাসে, সেদিনের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে, আজ যে দেশের নাম তামিলনাড়ু।

বাবা সরকারী কেরাণী, সামান্য রোজগার। পড়ার খরচ কি ক'রে দেবেন ?

কিন্তু মনে যার দুর্বার ইচ্ছা, তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কোন বাধাই বাধা হ'তে পারে না। সাহায্য দিতে এগিয়ে এলেন কয়েকজন বন্ধু ও আত্মীয়। তাঁদের সাহায্যে তিনি শেষ পর্যন্ত মেডিকেল গ্রাজুয়েট হলেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২১ সালে। একই বছরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস-সি. ডিগ্রি পেলেন। তার পরে তিনি মেডিকেল কলেজে ফিজিওলজি'র ডেমন্সট্রেটর হলেন অল্প সময়ের জন্য ১৯২১-১৯২২ সালে এইভাবে তাঁর সাধনার প্রথম অংশে তিনি সফল হলেন।

কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য তো ডাক্তার হ'য়ে পয়সা রোজগার করা নয়। তিনি ডাক্তার হ'য়েছেন এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। আবিষ্কার করতে চান এমন এক রোগের ওষুধ, যে রোগের কারণ তখনও বিজ্ঞানীদের অজানা।

উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি লণ্ডনে গিয়ে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন'এ ভর্তি হলেন এবং পরের বছর ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ডিপ্লোমা পেলেন।

লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিচার্ড স্ট্রং'এর পরিচয় হয়। সুব্বা রাও তাঁকে 'স্প্রু' সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললেন। শেষে অধ্যাপক বললেন, "দেখ, তোমার প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। তবে তুমি যদি হার্ভার্ডে আস, 'স্প্রু' সম্বন্ধে গবেষণার অনেক সুযোগ পাবে।" ১৩

সুব্বা রাও এ-সুযোগ ছাড়লেন না। মাত্র পঁচিশ ডলার হাতে নিয়ে ঐ বছরেই আমেরিকায় পাড়ি দিলেন ১৯২৩ সালে। কিন্তু ঐ টাকায় ক'দিন চলতে পারে ? সুতরাং তাঁকে কাজ নিতে হ'ল হাসপাতালের রান্নাঘরে। বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে আর্দালির কাজ নিলেন তিনি, পথের বিড়াল ধরে গবেষণাগারে সরবরাহ করতে

লাগলেন। না ক'রে উপায় কি? গবেষণা তো দূরের স্বপ্ন, পেটের ক্ষিদে মেটানোই তখন বড় সমস্যা।

কিন্তু কোন বাধা, তা সে যতই কঠিন হোক, তাঁকে দমাতে পারে নি। প্রায় বছর খানেক কষ্ট করার পর তিনি এক গবেষণা-বৃত্তি পেলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এই বৃত্তি শেষ হতে তিনি আর একটি বৃত্তি পেলেন রকেফেলার ফাউনডেশন থেকে। ১৯২৫ সালে তিনি ও হার্ভার্ডের বায়োকেমিষ্ট্রির অধ্যাপক ডাঃ ফিস্‌কে 'কলোরিমিটার' যন্ত্রের সাহায্যে শরীরে ফস্‌ফরাস নির্ণয়ের পদ্ধতি অবিষ্কার করেন। ১৯২৭ সালে তিনি ও ডাঃ ফিস্‌কে দুটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই প্রবন্ধে পেশী সঙ্কোচনের ফলে শরীরে কী রাসায়নিক পরিবর্তন হয়, সেই বিষয়ে তাঁরা আলোকপাত করেন।

ফসফরাস নিয়ে গবেষণা করার সময়ে তিনি যকৃতে এমন রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পেলেন যা 'পারনিসিয়াস এনিমিয়া'রোগ চিকিৎসায় ফলপ্রদ। এই কাজের মধ্যে তিনি পি-এইচ ডি'র জন্য গবেষণাপত্র জমা দেন। এবং ১৯৩০ সালে ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রায় একই সময়ে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল-এ বায়োকেমিস্ট্রির শিক্ষকের কাজ পান।

শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে গবেগণা চলতে থাকল। ১৯৩০-৩৮ সালের এর মধ্যে তিনি যকৃত থেকে প্রায় শতাধিক রাসায়নিক পদার্থ পৃথক করেন এবং প্রমাণ করেন, তার মধ্যে কয়েকটি পশু ও জীবাণুর পুষ্টির জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এই গবেষণা ভিটামিনের রাসায়নিক প্রকৃতি বিষয়ে বিজ্ঞানীদের জ্ঞানের সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে। হার্ভার্ড্-এ থাকার সময়ে তিনি পেলাগ্রা (Pellagra) রোগে কার্যকরী ওষুধ নিকোটিনিক এসিড (NicotinicAcid) আবিষ্কার ও পৃথকী করণ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৩৫-৩৮ সালের মধ্যে তিনি ও তাঁর সহযোগীরা আরো এগারোটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন প্রাণী ও জীবাণুর পুষ্টি বিষয়ে। ১৯৩৮ সালে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে

জৈব-রসায়ন বিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক পদে যোগ দিলেন।

তবে হার্ভার্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ তিনি ছেড়ে দিলেন ১৯৩৯ সালে। ওখানে তিনি গবেষণা কাজে আর্থিক সাহায্য পেয়েছিলেন কয়েকটি সংস্থার বদান্যতায়। কিন্তু এই ধরনের গবেষণা কাজে দরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ। সেইজন্য তিনি নিউইয়র্কে বিখ্যাত ঔষধ প্রস্তুতকারক সংস্থা লেডারলে ল্যাবরেটারীতে সহযোগী পরিচালক পদে যোগ দিলেন এখানে গবেষণা কাজে টাকার অভাব হলো না। দু'বছর পরে তিনি সেখানেই পরিচালক পদে উন্নীত হলেন।

তাঁর পরিচালনায় এই ল্যাবরেটারী অনেক বিখ্যাত ওষুধ বিশ্বের রোগীদের জন্য উপহার দিয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি ওষুধের নাম সাধারণ মানুষের মধ্যে সুপরিচিত, যেমন, সালফামেজাথিন, অরিওমাইনি, ডাইএথিল-কারবামেজিন ইত্যাদি। এই সময়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক ভুল ধারণা ছিল ঃ একই ভিটামিনকে বিভিন্ন ল্যারেটারী বিভিন্ন নাম দিয়েছিল, যেমন ভিটামিন এম, বি$_{১০}$, বি$_{১১}$, ইউ. আর. এস. ইত্যাদি। ডঃ সুব্বা রাও সেই ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিয়ে জানালেন, নানা নামের ঐ ভিটামিন আসলে ফলিক এসিড। এই ওষুধটি 'মেগালোব্লাস্টিক এনিমিয়া' রোগে খুব ভাল কাজ করে। শুধু তাই নয়, কয়েক বছর চেষ্টার পরে তিনি ও তাঁর সহকারীরা ল্যাবরেটারীতে কৃত্রিম উপায়ে ফলিক এসিড তৈরী করেছিলেন।

ডঃ সুব্বা রাও-এর নানা বিষয়ে গবেষণা তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছিল। কোষের (Cell) পুষ্টি বিষয়ে তাঁর গবেষণা ক্যানসার কোষ ও লিউকিমিয়া রোগেও পরবর্তী বিজ্ঞানীদের সহায়তা করেছিল।

মাত্র ৫২ বছর বয়সে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৯৪৮ সালের ৯ই আগষ্ট অকালে মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন লেডারলে গবেষণাগারের পরিচালক। তাঁর মৃত্যুর পরে গবেষণাগারের লাইব্রেরী তাঁর নামে উৎসর্গ ক'রে নাম দেওয়া হয়, 'সুব্বা রাও স্মৃতি পাঠাগার (Subba Rao

Memorial Library)।

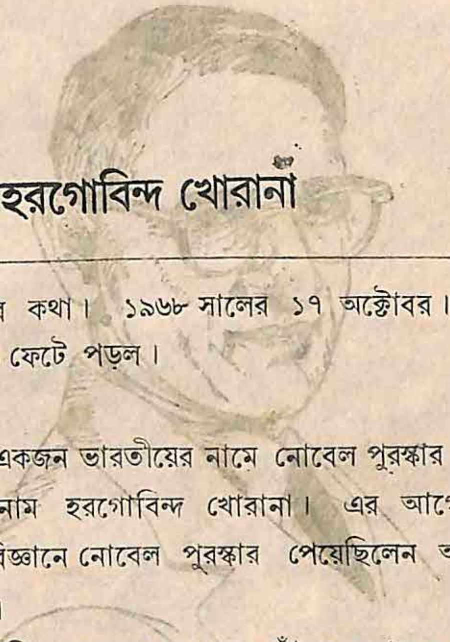
ডঃ সুব্‌বা রাও-এর কর্ম জীবন প্রায় সবটাই কেটেছে গবেষণা ও অধ্যাপনায়। শেষের দিকে তিনি বুঝলেন, জীবনের আরও একটা দিক আছে, যেদিকে তাঁর দৃষ্টি দেওয়ার সময় হয়নি। শেষ বয়সে তিনি সাঁতার শিখলেন। গাড়ী চালানো, ঘোড়ায় চড়া, এমন কি বিমান-চালনা শিখে লাইসেন্স নিয়ে একটা বিমানও কিনে চালাতে আরম্ভ করেন। বোধহয় তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর শেষ সময় আসছে জীবনের শখ-সাধ অপূর্ণ থাকবে কেন?

তিনি ছিলেন গরীবের ছেলে। গরীবের দুঃখ তিনি অনুভব করতে পারতেন। নিজে যখন প্রচুর আয় করেছেন নিজের সংসার খরচের টাকা রেখে বাকী টাকা দান ক'রে দিতেন। টাকার অভাবে কোনো ছাত্রের ডাক্তারী পড়া হচ্ছে না, কথাটা কানে শুনলেই তিনি তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। তবে কখনো নিজের নাম প্রকাশ করেন নি। হাসপাতালে কোনো রোগীর টাকার অভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না খবর পেলেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

সুব্‌বা রাও ছিলেন ধর্মবিশ্বাসী, তবে সংকীর্ণচিত্ত নন। ১৯৪৮ লেডারলে কোম্পানি পশ্চিম ভারতের বুল্‌সরে একটি কারখানা স্থাপন করে। কারখানার প্রবেশপথে একটি ফলকের উপর সুব্‌বা রাওয়ের বাণী লেখা আছেঃ বিজ্ঞান কেবল আয়ু বাড়াতে পারে, কিন্তু ধর্ম জীবনে গভীরতার অনভূতি আনে।' ধর্ম বলতে তিনি কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিশ্বাসকে বোঝান নি।

ডঃ সুব্‌বা রাও উপাসনা করতেন গির্জায়। এবং টাকার অভাবে গির্জাটি বন্ধক দেওয়ার পর যখন ছাড়াবার জন্যে টাকার দরকার হয়, তিনি অকৃপণভাবে সাহায্য করেন! বড়দিনের সময় সান্তাক্লজ্‌ সেজে শিশুদের ইচ্ছাপূরণ ক'রে তিনি আনন্দ পেতেন। অথচ এমনও দিন গিয়েছে যে বড়দিনের সময় তাঁর হাতে পয়সা নেই।

উদারচেতা এই মহান বিজ্ঞানী ছিলেন এক প্রকৃত মানবতাবাদী।



হরগোবিন্দ খোরানা

এই তো সেদিনের কথা। ১৯৬৮ সালের ১৭ অক্টোবর। সারা ভারতের মানুষ খুশীতে ফেটে পড়ল।

কেন?

অনেকদিন পরে একজন ভারতীয়ের নামে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর নাম হরগোবিন্দ খোরানা। এর আগে সেই ১৯৩০ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরমন।

ডাঃ খোরানা'র কি অবদান, যে জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল?

খোরানা প্রমাণ করেছিলেন যে নিউক্লিক অ্যাসিড তিনটি মৌলিক উপাদানে তৈরী এবং তিনি কৃত্রিম রাসায়নিক উপায়ে তা তৈরী করতে পেরেছিলেন। এর ফল হতে পারে সুদূরপ্রসারী। এর দ্বারা জীনের প্রকৃতি বদল সম্ভব হতে পারে। জীন বাহিত বংশগত রোগের হাত থেকে মানুষ হয়ত বাঁচতে পারবে সুতরাং বিজ্ঞানের দিক থেকে এই আবিষ্কার যুগ পরিবর্তনের সূচনা করল।

'জীন' কি?

জীন হোল বংশানুক্রমিক ধারার বাহক। জীন থাকে ক্রোমোজোমের সঙ্গে। আর ক্রোমোজোম থাকে কোষের মধ্যে।

আর কোষের মধ্যে থাকে নিউক্লিয়াস; তার মধ্যে থাকে পাকান দড়ির মত ক্রোমোজোম। আর তার সঙ্গে জুড়ে থাকে



হরগোবিন্দ খোরানা

জীন। প্রাণীর প্রকৃতি ও রূপ প্রকাশে যার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

এ তথ্য আজ আমরা জেনেছি। কিন্তু অনন্তকাল থেকে দেখা যায় পিতা-মাতার চেহারার সঙ্গে সন্তানের চেহারার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু কেন এই মিল? উত্তরাধিকার সূত্রে কি এমন জিনিষ সন্তান পায় যে জন্য এরকম সাদৃশ্য সম্ভব হয়?

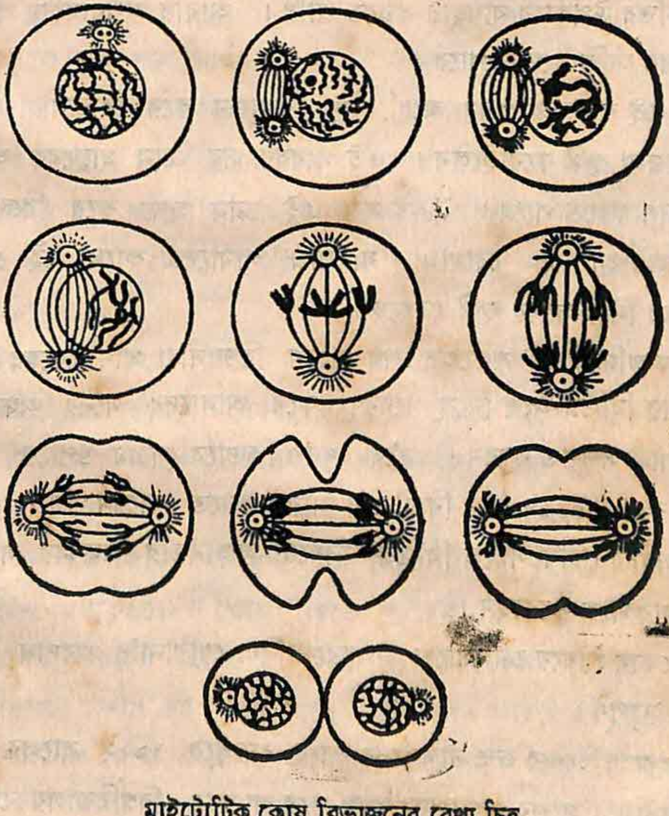
এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে ডাঃ খোরানার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার দিন থেকে আমাদের প্রায় ১১০ বছর পিছিয়ে যেতে হবে। ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইন ঐ বছরে তার বিখ্যাত গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছিলেন 'অরিজিন অব স্পেসিজ' (Origin of Species) বই এর মধ্যে।

এই সময়ের আরও দশ বছর পরে ফ্রেডরিক মিশার নিউক্লিক

অ্যাসিড আবিষ্কার করেছিলেন। শুক্রকীট থেকে ডি-এন-এ (Deoxy Nucleic Acid) আবিষ্কার করেন মিশার। অর্থাৎ ডাঃ খোরানা নোবেল প্রাইজ পাবার একশ বছর আগে। বড্ড আগে এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছিলেন মিশার। সেইজন্য তাঁর আবিষ্কারের গুরুত্ব সে যুগের বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন নি।

মিশারের জন্ম ১৮৪৪ সালে। তিনি মারা যান মাত্র ৫১ বছর বয়সে ১৮৯৫ সালে।

ডি-এন-এ আবিষ্কারের অল্পদিন পরেই আর-এন-এ (Ribo Nucleic Acid) আবিষ্কার হোল। এই দুটি উপাদান অনেকগুলি অণু দিয়ে তৈরী হয়েছে। আর সেই অনুর গঠনও খুব জটিল। সেইজন্য সেকালের বিজ্ঞানীদের অনুর কার্যকলাপ বুঝতে অনেক সময় লেগেছিল।



মাইটোটিক কোষ বিভাজনের রেখা চিত্র

এদিকে জার্মানীতে ভাইসম্যান নামে এক বিজ্ঞানী কোষের মধ্যে কি থাকে, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে খুঁজতে লাগলেন। কোষের প্রকৃতি ভাগ হয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করা। চোখে পড়ল কোষের মধ্যে পাকান দড়ির মত কি একটা জিনিষ। দেখা গেল কোষ যখন ভাগ হয়ে এক থেকে দুই হয়, তখন ঐ 'দড়ি'র জট খুলে যায় এবং দড়ি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তারপরে ভাঙ্গা টুকরোগুলো জোড়ায় জোড়ায় কোষের দুই প্রান্তে এসে জড়ো হয়। ভাইসম্যান দড়ির ভাঙ্গা অংশগুলির নাম দিলেন 'ক্রোমোসোম' (Chromosome)। মানুষের শরীরের প্রতি কোষে থাকে ৪৬টি ক্রোমোসোম।

বিজ্ঞান যে জ্ঞান আমাদের দেয়, তা আমরা মানুষ, প্রাণী ও প্রকৃতির উপকারে ব্যবহার করতে পারি। আবার অপব্যবহার বিশ্বের অশেষ ক্ষতি করতে পারে।

এই শতকের প্রথম অর্ধে অণু বিভাজন করে বিজ্ঞানীরা দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলেন। এই গবেষণা লব্ধ জ্ঞান মানুষের অনেক কল্যাণ করতে পারে। একই সঙ্গে এই জ্ঞান লাভ করে বিজ্ঞানীরা গড়লেন আণবিক বোমা। যা আজ আমাদের কাছে এই গ্রহের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় সৃষ্টি করেছে।

অন্যদিকে এই শতকের শেষ অংশে বিজ্ঞানীরা প্রাণী দেহের কোষ ও তার বিভিন্ন অংশ নিয়ে গবেষণা করে আমাদের মনের অন্ধকারে আলোক সম্পাত করেন। তবে এখনও কিভাবে কৃত্রিম উপায়ে প্রাণ সৃষ্টি করা যায়, সে জ্ঞান বিজ্ঞানীরা আয়ত্ত করতে পারেন নি। তাঁরা কেবলমাত্র কোষ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকার সরিয়ে আলোকপাত করেছেন।

কোষ বিষয়ে জ্ঞানলাভে ডাঃ হরগোবিন্দ খোরানা'র অবদান ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ।

হরগোবিন্দের জন্ম নাগপুরের কাছে রায়পুরে ১৯২২ সালের ৯ই জানুয়ারী। স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

বিজ্ঞানে স্নাতক হলেন ১৯৪৩ সালে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এস-সি পাশ করেন ১৯৪৫ সলে।

উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বৃত্তি নিয়ে লিভারপুল গেলেন। শিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরলেন ; ইচ্ছা এখানেই গবেষণা করবেন।

কিন্তু কোথায় কাজ ?

মাথায় ছোট, কালো রঙ'এর মাঝারি চেহারার মানুষটিকে কেউ পাত্তাই দিতে চায় না।

আর দেবেই বা কেন ? কারণ তিনি বড় বড় কথা বলতে পারেন না। বরং অন্যে কি বলে তাই মন দিয়ে শোনেন। নানা কথা ভাবতে ভাবতে মাথা নীচু করে চলা ফেরা করেন। এমন লোককে কি কেউ কখনও গুরুত্ব দেয় ?

ভারত তখন সবে স্বাধীন হয়েছে। যাঁদের ওপর চাকরী দেওয়ার দায়িত্ব, তাঁরা তো সর্ব বিষয়ে পণ্ডিত। হরগোবিন্দের মত একজন সাধারণ মানুষকে চাকরী দেবে কেন ? চাকরী কি এতই সস্তা ?

হতাশ হয়ে হরগোবিন্দ ফিরে গেলেন লিভারপুল, পরে কেমব্রিজ। কথায় আছে না 'গেঁয়ো যোগী—ভিখ পায় না।' এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল।

ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে স্যার আলেকজাণ্ডার টড'এর অধীনে ন্যাফিল্ড ফেলো হিসেবে গবেষণা করেন। ১৯৫৮ সালে পি-এইচ-ডি জৈব রসায়নে। তারপরে আর থেমে থাকেন নি, ধাপে ধাপে নিজেকে গড়ে তুলেছেন।

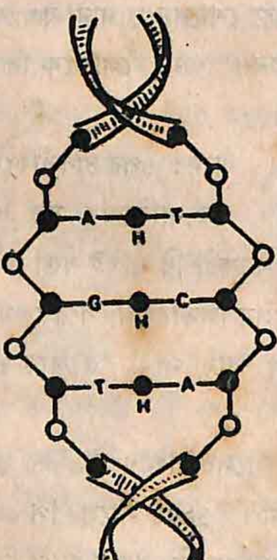
কেমব্রিজে তিনি নিউক্লিওটাইড নিয়ে গবেষণা করেন। অন্যেরা এ পর্যন্ত নিউক্লিওটাইড জোড়া দিতে পারেন নি। খোরানা নতুন রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করে নিউক্লিওটাইড জোড়া দিতে পেরেছিলেন। তবে এই সমস্যা নিয়ে তিনি তখন আর মাথা ঘামাননি।

কেমব্রিজ ছেড়ে খোরানা কানাডা'য় এলেন। সেখানে ভ্যাঙ্কো-ভারে কৃষি বিভাগের গবেষণাগারে কাজ নিলেন। সে কাজ পছন্দ

হোল না ; কারণ সে কাজটা ছিল রুটিন বাধা, আর একঘেয়ে।

সে কাজ ছেড়ে কিছুদিন জৈব রসায়ন নিয়ে গবেষণা করলেন। ক্যানাডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি তাঁকে মার্ক প্রাইজ দিয়ে সম্মানিত করেন।

কানাডা ছেড়ে এবার আমেরিকায় পাড়ি দিলেন। সেখানে উইসকন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ আরম্ভ করলেন। দীর্ঘ আট বছর গবেষণা করে চৌষট্টি রকম ট্রাই-নিউক্লিওটাইড আবিষ্কার করেন।



শরীর
অভ্যন্তরের যন্ত্র
তন্তু বা কলা
কোষ
নিউক্লিয়াস
ক্রোমাটিন
ক্রোমোজোম
জীন (ডি. এন. এ)

মধ্যের কালো গোল চিহ্ন—হাইড্রোজেন

H--হাইড্রোজেন শৃঙ্খল A—এডিনিন T—থাইমিন

G--গুয়ানিন C—সাইটোসিন

ধারের কালো গোল চিহ্ন—পেনটোস

ধারের সাদা গোল চিহ্ন—ফসফেট

একনজরে জীনের গঠন

ডাঃ খোরানা জৈব রসায়নে যুগান্তকারী সফলতা ঘটালেন ডি-এন-এ'কে সংশ্লেষণ করে! ডি-এন-এ একটা ছক বাঁধা নিয়মে দেহের প্রতিটি কোষে তেইশ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে সাজান থাকে। এরাই প্রাণীর বংশগত ধারা কেমন হবে তা নির্ণয় করে এবং প্রাণীকে সেই মত চালনা করে।

যেহেতু ক্রোমোজোমের জীন কোষের সবরকম কাজ পরিচালনা করে ; সুতরাং জীনের চরিত্র জানা থাকলে প্রাণীর প্রকৃতি কি হবে, তা আগে জানা সম্ভব হতে পারে।

জীনে'র মধ্যে লুকানো সাঙ্কেতিক তথ্য গভীর ভাবে জানা এবং সেগুলি বুঝবার সুযোগ এনে দিয়েছেন ডাঃ খোরানা। মানুষের দৃষ্টির বাইরের এই অতি ক্ষুদ্র অণু'র বিশাল জগৎ সম্পর্কে তাঁর এই গবেষণা হয়ত কোন জন্মগত বা বংশগত রোগ কেন হয়, কিভাবে তার উৎপত্তি, কি ভাবে আমাদের শরীরের কোষে কেন মারাত্মক ধরনের রূপান্তর হয়, সে সম্বন্ধে আমাদের মনের অন্ধকার দূর করতে সাহায্য করবে।

উইসকন্‌সিনে তিনি যখন জীনে'র মর্মোদ্ধারে ব্যস্ত সেই সময় এনজাইম ইনস্‌টিটিউটের অধ্যাপক এলভিয়েম-এর মৃত্যু হোল। ডাঃ খোরানা তাঁর সঙ্গে সহ-পরিচালক হিসেবে কাজ করতেন। এই পরিস্থিতিতে ডাঃ খোরানা'কে অধ্যাপক এলভিয়েম-এর পদে নিয়োগ করা হোল, তিনি কিন্তু তখনও আমেরিকার নাগরিক হন নি। তিনি আমেরিকান নাগরিকত্ব পেলেন ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

ঐ বছরেই ১৬ই অক্টোবর তাঁর নোবেল প্রাইজ পাওয়ার খবর তিনি পেলেন তাঁর স্ত্রী এসথার-এর কাছে।

তাঁর নোবেল প্রাইজ পাওয়ার খবর শুনে তাঁর এক সময়ের গুরু লর্ড টড মন্তব্য করেছিলেন, 'আমি ও গোবিন্দ নিউক্লিওটাইড নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করে কয়েকটি উপায়ে কৃত্রিম ভাবে সেটি সৃষ্টি করতে পেরেছিলাম। আমার অবদান ছিল নিউক্লিক এসিডের রাসায়নিক প্রকৃতি

উন্মোচন করা। গোবিন্দ তার পরেও থেমে থাকেনি। আমি জানতাম ও একটা বড় কিছু করবে। ও অতি উচ্চ শ্রেণীর গবেষক। যে দেশ তাকে গবেষণার সুযোগ দিতে পারে না, সে দেশ তাকে পাবে না। সে তো থেমে থাকবার লোক নয়। আর আমার দিক থেকে বলতে পারি, শিষ্য নোবেল পুরস্কার পাক, এর চেয়ে বড় আশা করার আর কিছূ থাকতে পারে না।'

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য স্যার (পরে লর্ড) আলেকজাণ্ডার টড নিজেও নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৫৪ সালে।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর কিন্তু তাঁর ব্যবহারে কোন রকম অহঙ্কার দেখা যায় নি। সাংবাদিকদের তিনি বললেন, 'আমার সহকর্মীদের পরিশ্রম আমাকে এই সম্মান এনে দিয়েছে।'

টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হোল, 'আপনি তো এখন অনেক টাকা পেলেন ; ঐ টাকায় কি করবেন?'

খোরানা হেসে উত্তর দিলেন, 'কি আর করব? একটা বড়সড় ভোজ দেব।'

ও দিকে নিজের সংসারের ব্যাপারে তাঁর কোন রকম দায়-দায়িত্ব, ভাবনা চিন্তা ছিল না। সে সব দায়িত্ব মাথায় নিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী এসথার। তাঁর মাথায় শুধু গবেষণার চিন্তা। এমন কি গল্প করার সময় তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। ল্যাবরেটারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বিভাগে প্রশাসনিক দায়িত্ব তাঁর সচিবের ওপর দেওয়া আছে। এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হলে হয়ত গবেষণা করা সম্ভব হোত না।

ডাঃ খোরানার এই সাফল্যে বোধ হয় ভাগ্যের কিছু সহায়তা ছিল। যদি ভারতে তিনি তখন কাজ পেতেন তাঁর পক্ষে গবেষণায় সাফল্য অর্জন সম্ভব হোত কিনা সন্দেহ। হয়ত তিনি বারবার চেষ্টা করে হতাশ হয়ে আর পাঁচ জনের মত গতানুগতিক কাজে জড়িয়ে পড়তেন। সেইজন্য মনে হয় এখানে কাজ না পেয়ে দেশের ক্ষতি হলেও, তাঁর নিজের ও বিশ্বের পক্ষে ভাল হয়েছিল।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	পড়তে হবে
২২	১৪	Phyelonepritis	Pyelonephritis
২৪	৪	Sphymomanometer	Sphygmomanometer
৩৪	১৪	১৯১৯ সাল	১৯২৯ সাল
৩৭	৭	হাজের	হার্জের
৪০	৪	ভেনাকেডা	ভেনাকেভা
”	৮	ফিকিওথেরাপী	ফিজিওথেরাপী
”	৯	প্রনাণিত	প্রমাণিত
৪৬	শেষ	সায়নে	রসায়নে
৫১	১৪	প্রিসলি	প্রিসলে
৫২	২৩	১৭১৪	১৭৯৪
৬২	৪	হাভয়সিয়েরের	ল্যাভয়সিয়েরের
৭৬	২	রোগ	রোগে
”	৩	অথিকাংশের	অধিকাংশের
”	১৮	ভুলে	ভুগে
৭৭	৭	চিকিৎক	চিকিৎসক
৭৯	১৬	কিরূপ	বিরূপ
৮০	২০	চিকিৎসক	চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক
৮১	৪	সষ্টি	সৃষ্টি
”	৮	হাসনেন	হানসেন
৮২	৫	মরভূমিতে	অনুভূতিতে
৮৪	২	মাইকোব্যাকটেরিয়াল	মাইকোব্যাকটোরিয়াম
৮৪	২৩	৮৮১ সালে	১৮৮১ সালে
৮৫	২০	যে	যেখানে
৮৬	৩	অপরদিন	পরদিন
৮৮	৩	ডাঃ	ডাচ
৮৮	৫	ক্রিশ্ছিয়ান	ক্রিশ্চিয়ান
৮৮	১১	খাচ্চে	খাচ্ছে

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	পড়তে হবে
৮৯	১৬	এমাইল	এমাইন
৯০	১	গবেষণার সুযোগ পেলেন	গবেষণা করার
৯২	২১	১৯১৫ সালে	১৯১৪ সালে
৯৫	৯	খেলেন	হল না
৯৬	২৬	অ্যাসিড	অ্যাসিড পাওয়া গেল
৯৭	১৪	অভাবে হাড়ে	মানুষের অভাবে হাড়ে
৯৯	২	রেজিষ্টারের	রেজিষ্ট্রারের
”	৯	রেজিষ্টার	রেজিষ্ট্রার
১০০	৮	রেজিষ্টারের	রেজিষ্ট্রারের
১০১	১৯	য়িচার্ড	রিচার্ড
১০৯	১১ ও		
	১২	অরিওমাইনি	অরিওমাইসিন



ডাঃ মনীশ প্রধানের জন্ম ১৯২৫ সালে কলকাতায়। পড়াশুনা কলকাতার হেয়ার স্কুলে। ১৯৪৭ সালে আর. জি কর মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. পাশ করেন। পরে মেডিকেল কলেজ থেকে টি. ডি. ডি. ও সবশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি. হন। "আমেরিকান কলেজ অফ চেষ্ট ফিজিশিয়ানস্"-এর সাম্মানিক এমেরিটাস ফেলো। আর. জি. কর মেডিকেল কলেজের বক্ষবিভাগের অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান। পূর্বরেল হাসপাতালের কনসালট্যাণ্ট। চিকিৎসকদের জাতীয় সংস্থা ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসো-সিয়েশনের বঙ্গীয় রাজ্য শাখা ও কলকাতা শাখায় তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসাবিজ্ঞান লেখক হিসাবে তাঁর অবদান প্রশংসার দাবী রাখে। "হাঁপানি রোগ" বইটিই তার প্রমাণ। বইটি সাধারণ মানুষের যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করেছে। ডাঃ প্রধানের আর একটি উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় গ্রন্থ "আবিষ্কারের পিছনে"-র তৃতীয় মুদ্রণ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে। "আবিষ্কারের পিছনে" ও বর্তমান গ্রন্থে তিনি প্রাচীনকাল থেকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তনের ঐতিহ্যবাহী ধারাটি তুলে ধরেছেন। তাঁর পরবর্তী প্রকাশিতব্য গ্রন্থ দুটি যথাক্রমে "হৃদরোগ" ও "শেষযুদ্ধ।" ডাক্তারি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে তিনি রচনা করেছেন একটি মর্মস্পর্শী উপন্যাস, "খেলার পুতুল নই"।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ অনুপ রায়।